श्रमण

ISSN : 0975-8550

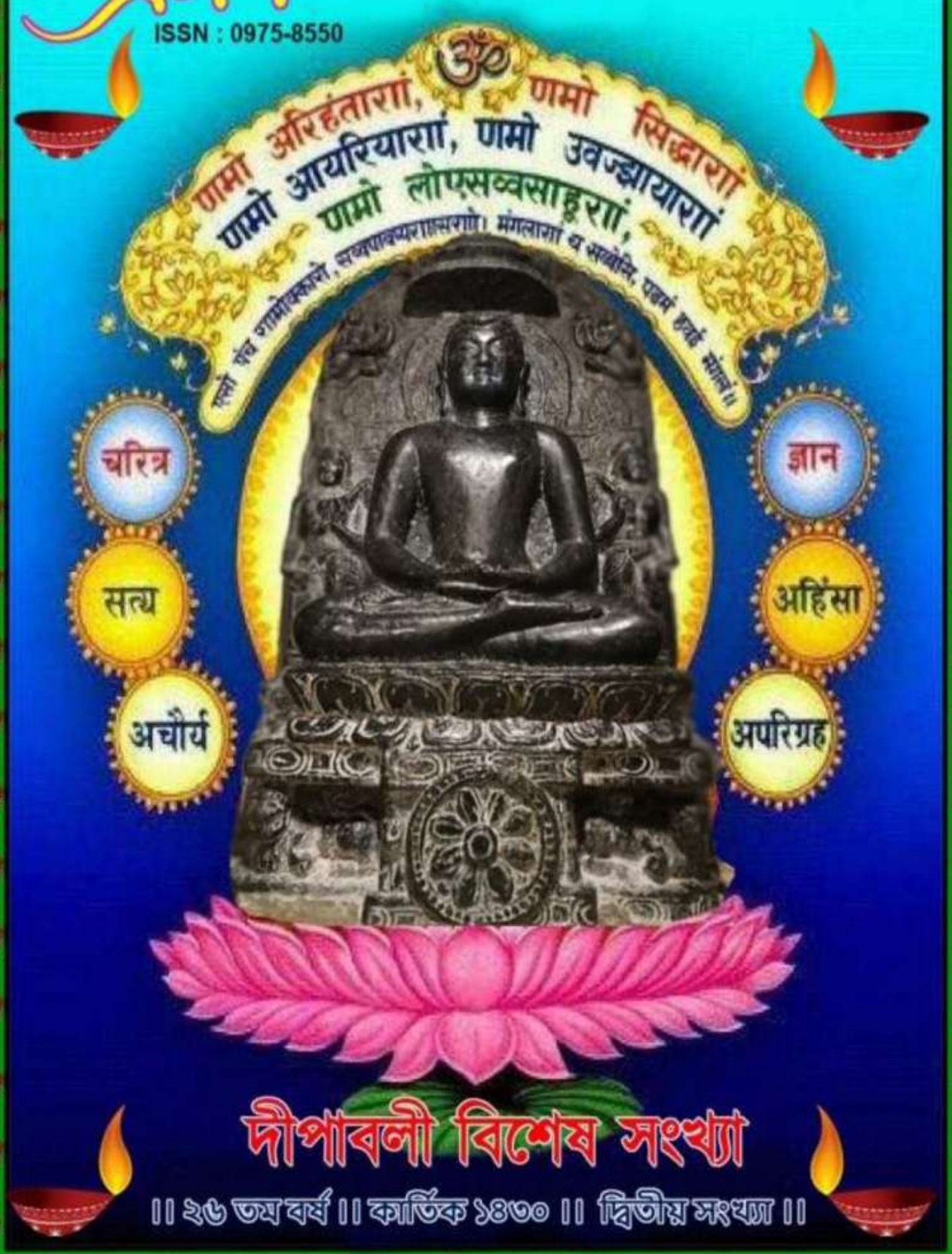

दीपावली विशेष संख्या

॥ २६ तम वर्ष ॥ कार्तिक १४३० ॥ द्वितीय संख्या ॥

শ্রমণ ॥ ২৬ তম বর্ষ ॥ কার্তিক ১৪৩০ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা তথা দীপাবলী সংখ্যা ॥

ISSN : 0975-8550

সূচীপত্র

1. সম্পাদকীয় 2

2. ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্বের আলোকে চব্বিশ তীর্থঙ্কর – ডঃ লতা বোথরা 4

3. জৈন সংস্কৃতিতে তপ – একটি আলোচনা – সৃজিতা মৈত্র 9

4. আগম পাঠ : ভগবতী সূত্র – শ্রীকান্ত জৈন 23

5. জৈন চেতনায় দীপাবলী – সুখময় মাজী 29

6. জৈন ধর্ম - ভারতীয় দর্শনে অহিংসার সন্ধানে – রাজীব মজুমদার 38

7. পার্শ্বনাথমূর্তিকথা – সঞ্জীব চক্রবর্তী 46

8. তীর্থঙ্কর মহাবীরের মহানির্বাণ এবং তারপর – মুহাম্মদ তানিম নওশাদ 51

9. হিড়বাঁধ পরিমণ্ডলে অনালোচিত জৈন মূর্তি
ও ভাস্কর্যঃ ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোকে - সুমিত মহন্ত 55

10. অঞ্জন চোরের কথা - জয়শ্রী লাহা 66

সম্পাদক
ডঃ লতা বোথরা

সহ-সম্পাদক
সুখময় মাজী

॥ জৈন ভবন ॥

প্রকাশক
জৈন ভবন
পি-25, কলাকার স্ট্রীট, কোলকাতা -700007

সম্পাদকীয়

বাংলায় জৈন ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের জগতে 'শ্রমণ'কে অন্যতম পুরোধা বললেও অত্যুক্তি হয় না। কলকাতার 'জৈন ভবন' থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকা বরাবরই বহু বিদগ্ধ ব্যক্তির রচনায় সমৃদ্ধ থেকেছে এবং সেই লেখাগুলির অনেকগুলিই পরবর্তীকালে জৈন ভবন থেকেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাঙলা ভাষায় যাঁরাই জৈন ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁদের সবার কাছে 'শ্রমণ' পত্রিকা এবং 'জৈন ভবন' সম্পদের আকর স্বরূপে কাজ করেছে।

সম্প্রতি 'শ্রমণ' নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে; আপাততঃ 'ত্রৈমাসিক-পত্রিকা'-রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক কারণে মুদ্রিত কপির সংখ্যা সীমিত রাখতে হওয়ায় এবং ডাকযোগে গ্রাহকের কাছে প্রেরণের বিষয়ে কিছু অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা থাকায় জৈন ভবনের website-এর digital সংস্করণ রাখা হচ্ছে, যাতে যে কেউ যে কোন সময় এ'টি পড়তে পারেন।

আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে 'শ্রমণ' আজ প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে পেরেছে। ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও বহু বিশিষ্ট বিদ্বানের রচনায় সমৃদ্ধ হচ্ছে 'শ্রমণ'। কিন্তু দেশের পণ্ডিত সমাজের কাছ থেকে আমরা আরও একটু সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। এরই মধ্যে জৈন ইতিহাস এবং সংস্কৃতির মুষ্টিমেয় বাঙালী বিদ্বানদের অন্যতম মাননীয় শ্রীঅভিজিৎ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অকাল প্রয়াণ বঙ্গীয় সারস্বত সমাজকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বঙ্গে জৈন-চর্চায় এ এক অপূরণীয় ক্ষতি।

আমরা লেখকের স্বাধীনতা, পাঠকের স্বাধীনতা এবং সম্পাদকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তাই নিতান্ত আবশ্যক না হ'লে লেখকের লেখা সংশোধন, সংযোজন বা পরিমার্জনে আমরা প্রবৃত্ত হই না। বিশেষতঃ যাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার, তাঁদের লেখা তাঁদের নিজ নিজ নির্দেশক দ্বারা সংশোধিত ধরে নিয়ে সেগুলি অপরিবর্তিত আকারে প্রকাশের চেষ্টা করি। স্বাভাবিকভাবেই এখানে প্রকাশিত সব লেখার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে লেখকের নিজস্ব; সম্পাদকমণ্ডলী বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো দায়িত্ব নেবেন না। কোন বিষয়ে পাঠকের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া এলে আমরা যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে সেই প্রতিক্রিয়া পত্রিকার

পরবর্তী কোনো সংখ্যায় অবশ্যই প্রকাশ করব। যে কেউ শ্রমণে লেখা পাঠাতে পারেন। অর্থনৈতিক কারণেই লেখককে কোন সম্মান দক্ষিণা দিতে আমরা অপারগ, তবে সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য থাকবে না। মুদ্রণমাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যমে অপ্রকাশিত মৌলিক লেখাই একমাত্র বিবেচিত হ'বে।

জৈন সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবগত সকলেই জানেন, এই সংস্কৃতিতে দীপাবলী ভগবান মহাবীরের নির্বাণ কল্যাণক উৎসব রূপে পালিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই 'শ্রমণ'- এর দীপাবলী সংখ্যাটি ভগবান মহাবীরের প্রতিই সমর্পিত হ'ল। বীর নির্বাণ সম্বন্ধে বাঙলাদেশের প্রখ্যাত এক বিদ্বানের লেখা প্রচ্ছদ নিবন্ধ এই সংখ্যার অন্যতম সম্পদ। আমরা আশা রাখি এই বিশেষ সংখ্যা পাঠকমহলে সমাদৃত হ'বে। সকলকে দীপাবলীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। জয় জিনেন্দ্র।

সুখময় মাজী
সহ সম্পাদক

ডঃ লতা বোথরা
সম্পাদক

ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্বের আলোকে চব্বিশ তীর্থঙ্কর

- ডঃ লতা বোথরা

আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে কোনো এক জাপানী পণ্ডিতের একটা লেখা পড়েছিলাম, যেখানে তিনি চব্বিশ তীর্থঙ্করের অস্তিত্বের উপরই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। তাঁর মতে জৈনদের চব্বিশ তীর্থঙ্করের ধারণা হিন্দুদের বিষ্ণুর চব্বিশ অবতার এবং বৌদ্ধদের চব্বিশ বুদ্ধের অনুকরণ মাত্র। যে কেউ যে কোনও বিষয়ে সংশয় বা প্রশ্ন তুলতেই পারেন, কিন্তু কষ্ট হয় তখনই, যখন দেখি, জৈন সমাজের অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিও ২০ জন তীর্থঙ্করের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকেন। তাই এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে করি। উপরিউক্ত রচনা আমাকে বিস্তৃত অনুসন্ধানে প্রেরিত করে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত অধ্যয়ন করে উপলব্ধ সাহিত্যিক, পুরাতাত্ত্বিক এবং প্রাচীন পরম্পরার আধারে আমি যা জানতে পেরেছি, তা আমার অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য পুস্তকে আলোচনা করেছি। এখানে তাঁরই কিয়দংশ পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করছি।

বিশ্বের প্রাচীনতম পরম্পরা হল 'সমন' পরম্পরা বা শ্রমণ পরম্পরা। সমস্ত প্রাচীন সভ্যতায় আমরা সমন সংস্কৃতির সন্ধান পাই। এই 'সমন' ও 'শ্রমণ' শব্দ কোথা থেকে এল, কীভাবে এল এবং এর ব্যুৎপত্তি কী, তা গভীর গবেষণার বিষয়। শ্রমণ পরম্পরার প্রধান বিশেষত্ব হল জীববাদ বা Animism. বলা হয়ে থাকে, এই সমন পরম্পরা ২৫০০০ বছরেরও প্রাচীন। কোথাও আবার 'সমন' শব্দকে পরমানন্দ বা সচ্চিদানন্দ লাভের উপায় বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। তীর্থঙ্করদেরও 'সমন' বলা হয়েছে, কেননা তাঁরাই সমস্ত জীবকে মুক্তি, পরমাত্ম এবং অনন্ত আনন্দ লাভের পথ দেখিয়েছেন; আত্মা থেকে পরমাত্মায় উন্নীত হওয়ার উপায় জীবের কাছে এনে দিয়েছেন।

'সমন' এবং 'জিন' শব্দের সবচেয়ে প্রাচীন রূপ সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীন এবং তিব্বতে পাওয়া গেছে। 'সমন' শব্দ উত্তর এশিয়ার ইবেংক ভাষার শব্দ। চীন এবং মঙ্গোলিয়ান

ভাষায় এর অর্থ বিশুদ্ধ বা নিখাদ এবং সোনা। চীনদেশে সবচেয়ে বেশি 'সমন' এবং 'জিন' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। চীনা ভাষায় সমনকে WU বলে। ১৬০০ খ্রিস্টপুর্বাব্দে চীনে শাং বংশের শাসনামলে Wu শব্দের বর্ণন মেলে। পরবর্তীকালে এই শব্দই বৌদ্ধ গ্রন্থে 'শ্রমণ' রূপে লিপিবদ্ধ হয়। যদিও কিছু কিছু পণ্ডিতের মতে সাইবেরিয়ান 'সমন' এবং চীনা 'Wu' শব্দের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে, তবুও অনেকেই এই দুটি শব্দকে প্রায় সমার্থক বলে মনে করেন। লেখক আর্থার বেলি'র মতে, "Indeed the functions of the Chineese Wu were so like those of Siberian Tungus Shramans that it is convenient ..... to use as a translation of Wu". এইভাবে শ্রমণ শব্দ সমনেরই রূপভেদ। মিশর থেকে শুরু করে ইরান, ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া, গ্রীস, রাশিয়া, চীন, ভারত সহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আদি পরম্পরা ছিল সমন পরম্পরা। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ পূর্ব ভারতে সাঁওতাল, কোল, কিরাত, ইত্যাদি জনজাতিরাও এই পরম্পরাই বহন করেছে। চব্বিশতম তীর্থঙ্কর এই সমনানুসারী লোকেদের মধ্যেই বহু বছর সাধনা করেছেন। এইজন্য তাঁকে শ্রমণ ভগবান মহাবীর বলা হয়। এই পরম্পরাতেই জিন, অর্হত, অরিহন্ত, ব্রাত্য, নির্গ্রন্থ, শ্রমণ এবং তীর্থঙ্কর হওয়া যায়। এ বিষয়ে কয়েকটি বিন্দু লক্ষ্যণীয় –

১। এই সমন পরম্পরার প্রতিষ্ঠাতা জিতেন্দ্রিয় হওয়ার কারণে তাঁকে জিন নামে অভিহিত করা হয়।

২। সমস্ত পূজ্য গুণে গুণী হওয়ার কারণে 'অর্হত' নামেও তাঁকে বিশেষিত করা হয়।

৩। নিরন্তর যোগপূর্বক সদাচরণের পথে চলার কারণে তিনি বাতরশনা।

৪। ব্রত ধারণ করেন, সেজন্য ব্রাত্য।

৫। পূর্ণ সমতার সাধক এবং উদ্ঘোষক বলে তাঁর নাম সমন।

৬। স্বেচ্ছায় শ্রমপূর্বক তপ, ত্যাগ ও সংযমের মার্গ বেছে নেওয়ার কারণে তিনি শ্রমণ।

৭। সমস্ত অন্তরং এবং বহিরঙ্গ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে তিনি নির্গ্রন্থ।

৮। সংসারের দুঃখময় স্বরূপ জ্ঞাত হয়ে তা থেকে জীবের উত্তরণের জন্য ধর্মতীর্থ প্রবর্তন করেন বলে তিনি তীর্থঙ্কর।

৯। সমস্ত ভবাঙ্কুর ক্ষয় করার কারণে তিনি অরিহন্ত।

তীর্থংকরদের ঐতিহাসিকতা নিরূপণ করার আগে 'তীর্থঙ্কর' কনসেপ্টটা স্পষ্ট হওয়া জরুরি।'তীর্থঙ্কর' শব্দটি কোথা থেকে এল, এর অর্থ কী, এই শব্দ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন এবং এর বিশেষত্ব কী – এসব বিষয় আলোচনা করার পরই মূল বিষয়ে ঢোকা সমীচীন হবে বলে মনে করি।

যে কোনো মানুষ ব্রাত্য, জিন, নির্গ্রন্থ বা বুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তীর্থঙ্কর সবাই হতে পারে না। তীর্থঙ্করের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক করেছে। যদিও ব্রাত্য, জিন, বুদ্ধ, নির্গ্রন্থ, তীর্থঙ্কর – সবারই কেবলজ্ঞান হতে পারে, কিন্তু তীর্থঙ্কর তিনিই হন, যিনি কেবলজ্ঞান লাভের পর সাধু সাধ্বী শ্রাবক ও শ্রাবিকারূপ চতুর্বিধ সংঘ স্থাপন করেন। প্রাচীনকালে এই চতুর্বিধ সঙ্ঘকেই তীর্থ বলা হত এবং এই তীর্থ স্থাপন করার কারণেই সংঘের স্থপয়িতা তীর্থঙ্কর নামে অভিহিত হন। কেবলী এবং তীর্থঙ্কর – উভয়েই জ্ঞানের দিক থেকে সমান, কিন্তু কিন্তু তীর্থঙ্কর স্ব-কল্যাণের পর পর-কল্যাণের প্রয়াসী হন। তিনি তিন লোকের ত্রাতা তথা উদ্ধারক হন। একমাত্র ক্ষত্রিয় বংশেই তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করতে পারেন।

জৈন ধর্মে তো জাতিভেদের কোনো স্থান নেই; তাহলে কেন এই মান্যতা স্বীকৃত যে, ক্ষত্রিয় কুল ছাড়া তীর্থঙ্কর জন্মলাভ করেন না? আসলে একমাত্র ক্ষাত্রতেজ সমন্বিত ব্যক্তিই রাজবইভব ত্যাগ করে বহু কষ্ট ও বাধাবিঘ্নের মোকাবিলা করে অহিংসাব্রত পালন করার ক্ষমতা রাখেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য, সত্য ও সন্তোষ প্রধান ভিক্ষাজীবি হন, যেখানে ক্ষত্রিয় তেজস্বী, ওজস্বী, পরাক্রমশালী ও প্রভাবশালী হন। ব্রাহ্মণ কুলে জাত ব্যক্তি তেজস্বী ও ত্যাগী হতে পারেন না। তীর্থঙ্কর তাঁর তপসাধনা আত্মবলের দ্বারাই করেন; এজন্য তিনি কোনও দেব, দানব, যক্ষ রক্ষ বা তির্যঞ্চের সাহায্য গ্রহণ করেন না। স্বীয় সাহস, পরাক্রম এবং পুরুষার্থের দ্বারা নিজের

কর্মক্ষয় করাই যে আসল বীরত্ব, তা তীর্থঙ্কর চরিত্র থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

নমোত্থুণং নামক প্রাচীন শ্লোকে তীর্থঙ্করের গুণের বর্ণনা মেলে। এই শ্লোকে তীর্থঙ্করকে ধর্মের প্রারম্ভকারী, ধর্মপ্রদাতা, ধর্মোপদেশক, ধর্মমার্গের সারথি এবং ধর্মচক্রবর্তী বলা হয়েছে। তাঁর জীবনের লক্ষ্য নিজেকে সংসারচক্র থেকে মুক্ত করা, আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করা এবং অন্য প্রাণীদের এই লক্ষ্যে প্রেরিত করা। তিনি পুরুষোত্তম অর্থাৎ পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁকে সিংহের ন্যায় পরাক্রমী, পুণ্ডরীক অর্থাৎ পদ্মের ন্যায় বরণীয় এবং গন্ধহস্তীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ত্রিলোকের নাথ, লোকের অর্থাৎ ত্রিজগতের হিতকর্তা এবং দীপের ন্যায় ত্রিলোকের প্রকাশক।

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা তীর্থঙ্কর পরম্পরাকে চিহ্নিত করতে পারি। যথা –

১) তীর্থঙ্কর কোনো অবতার নন। সাধারণ মানুষরূপেই তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু হয়।

২) স্বস্তিক চিহ্নের অবধারণা তীর্থঙ্করের সাথে যুক্ত।

৩) অহিংসা মার্গের অগ্রপথিক।

৪) তীর্থযাত্রার পরম্পরা।

৫) তীর্থঙ্করদের লাঞ্ছন অর্থাৎ প্রতীক।

৬) প্রাচীন জাতিসমূহ।

৭) প্রাচীন অভিলেখ।

৮) তীর্থংকরদের বিভিন্ন নামের প্রচলন।

৯) প্রাচীন সাহিত্য এবং লেখকদের বিবরণ।

১০) মূর্তি নির্মাণ।

জৈন দর্শনে ২৪ জন তীর্থঙ্করের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক কালে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের আবির্ভাবের কথাই শাস্ত্রে কথিত আছে। কিন্তু তীর্থঙ্করের সংখ্যা ২৪ই কেন? এই ২৪ সংখ্যার

কী তাৎপর্য? আমরা দেখতে পাই, এক দিনে মোট ২৪ ঘন্টা থাকে। সবচেয়ে বিশুদ্ধ সোনা হল ২৪ ক্যারাট। চীনা ভাষায় জিন শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ অথবা স্বর্ণ। গ্রীক বর্ণমালায় মোট ২৪টি বর্ণ রয়েছে। অশোকের ধর্মচক্রে ২৪টি স্পোক আছে। খ্রিস্টানদের ধার্মিক গ্রন্থেও ২৪ জন প্রবীণের উল্লেখ রয়েছে। "Surrounding the throne were twenty four other thrones, and seated on them were twenty four elders." (The Book of Revelation). জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে সমস্ত গ্রহ কখনো একসাথে উচ্চ স্থানে অবস্থান করতে পারে না; কিন্তু এক কালপর্যায়ে কেবলমাত্র ২৪ বার এমন যোগ আসে যখন সমস্ত গ্রহ একসাথে উচ্চ অবস্থানে আসে। এই ২৪ উত্তম যোগেই ২৪ তীর্থঙ্করের জন্ম হয় বলে কল্পসূত্রের টীকায় আচার্য সোমদেব মতপ্রকাশ করেন। বৌদ্ধদের ২৪ বুদ্ধের মধ্যে কয়েকজন জৈন তীর্থঙ্করের নামও আছে; অর, নমি, অজিত, ইত্যাদি। ভগবান বিষ্ণুরও ২৪ অবতারের মান্যতা হিন্দু ধর্মে স্বীকৃত; এই বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্যে অনেক তীর্থঙ্করের নামও রয়েছে। যথা – বৃষভ, শান্তি, সম্ভব, অনন্ত, শান্তি, সুব্রত, বর্ধমান, অজিত, ইত্যাদি। এই সব নামের উল্লেখ থেকে ধারণা করা যায় যে মহাভারতের যুগেও তীর্থঙ্করদের উপাসনা প্রচলিত ছিল।

জৈন সংস্কৃতিতে তপ – একটি আলোচনা

Srijita Maitra
Ph.d Research Scholar
Visva Bharati
Smaitra33@gmail.com
Mob: 7384005585

অনন্তকাল ধরে সঞ্চিত কর্মমল দ্বারা আত্মা মলিনতা প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতগণ এই আত্মশুদ্ধির উপায় বিভিন্ন মতে বিভিন্ন পথে খুঁজেছেন। জৈন ধর্মের দৃষ্টিতে ক্ষণিকের মধ্যে এই আত্মশুদ্ধিতা ঘটতে পারে একমাত্র তপের দ্বারা। জৈন সংস্কৃতিতে তপ একটি প্রধান তত্ত্ব রূপে স্বীকৃত। স্থানাংগ সূত্রে যে দশপ্রকার ধর্মের উল্লেখ প্রাপ্ত হয়। যথা- খংতী, মুত্তী, অজ্জবে, মদ্দবে, লাধবে, সচ্চে, তবে, চিয়াএ, বংভচের, বাসে[১]- এইগুলির মধ্যে তপ অন্যতম। যেহেতু জৈন সংস্কৃতি অনুযায়ী ধর্ম তাই একে উৎকৃষ্ট মঙ্গল বলা হয়েছে দশবৈকালিকসূত্রে।[২] ধম্মো মংগল মুক্কিট্ঠং, অহিংসা সংজমো তবো। ধর্ম উৎকৃষ্ট মঙ্গল। অহিংসা, সংযম, তপ এগুলিই ধর্ম। বৈদিক সংস্কৃতিতে তপ থেকেই ঋত এবং সত্য সমুৎপন্ন এরূপ বলা হয়েছে।[৩] মনুসংহিতা অনুযায়ী যা দুর্লভ এবং দুষ্কর তা সবই তপের দ্বারা সাধ্য।

সদ দুস্তরং যদদুরাপং দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্বং তু তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমম্।।[৪]

জীবনোত্থানের প্রশস্ত পথ তপ সকল তীর্থংকরগণের পূর্বভবে সাধনার বিষয় ছিল কারণ এই সাধনার ফলেই তাঁরা তীর্থংকর এই গৌরবময় পদ প্রাপ্ত হয়েছেন।

তপের নিরূক্তিপরক ব্যাখ্যা- তপ শব্দ তপ্ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ যার অর্থ উত্তপ্ত হওয়া, জ্বলা।[৫] জৈন সংস্কৃতি অনুসারে কর্মগুলিকে জ্বালানো হয় যার দ্বারা সেটিই তপ। অত্যন্ত কঠোর ধার্মিক সাধনা তপ বা তপস্যা। তপস্যার দ্বারা রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, মদ, শুক্র উত্তপ্ত হয়, শুকিয়ে যায় এবং অশুভ কর্ম বিনষ্ট হয়। আচার্য মলয়গিরির মতে অষ্ট প্রকার কর্ম কে উত্তপ্তপূর্বক বিনষ্ট করাই হল তপ। তাপয়তি অষ্টপ্রকারকর্ম ইতি তপঃ।[৬] উত্তরাধ্যয়নসূত্রে বলা হয়েছে যে সংযমী পুরুষ নিজ আত্মায় কোটি ভবে সঞ্চিত কর্মের ক্ষয় করবেন তপস্যা দ্বারা।[৭] উমাস্বাতির মতে ইচ্ছা নিরোধস্তপঃ। অর্থাৎ ইচ্ছার উপর নিয়ন্ত্রণই তপ। এইভাবে বিভিন্ন

আচার্যদের মত অনুধাবন করে জানা যায় যে তপ হল এমন এক সাধনা যার দ্বারা মানুষ ইন্দ্রিয় তথা মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, বিষয়ের থেকে নিস্পৃহ থেকে নিজেকে অন্তর্মুখী করে তোলে এবং এভাবেই আত্মদর্শন সহজ হয়ে ওঠে।

আত্মশুদ্ধি এবং কর্মনাশের জন্য তপ এক অমোঘ সাধন। তপের ন্যায় সাধন দ্বারা কর্ম রূপ বন্ধন বিদীর্ণ করে সাধক বাস্তবিক বিজয় লাভ করেন এবং সংসার রূপ সাগর অতিক্রম করে ঐ দিব্যলোকে যাত্রা করেন যেখানে আধি, ব্যধি এবং উপাধির চিহ্ন থাকে না, সেখানে শুধুমাত্র সদা শাশ্বত, অখণ্ড, অবিভাজ্য, অলৌকিক আনন্দের উপলব্ধি ঘটে থাকে।

এবং তু সংজয়স্সাবি, পাবকম্মং নিরাসবে।
ভব কোডি সংচিয়ং কম্মং, তবস্সা নিজ্জরিজ্জঈ।। (উত্ত০ ৩০/৬)

সোনা যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে বিশুদ্ধ হয়ে অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় তেমনই তপ রূপ সাধনে দগ্ধ হয়ে অন্তর্শুদ্ধিকরণের দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে।

তপ হল সেই প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানবমনের অবাঞ্ছিত তত্ত্ব বিনষ্ট হয় ফলে চেতনার উর্ধ্বারোহণ সম্ভব হয় এবং সাধকের জীবনে শান্তি ও আনন্দের অনুভূতি উপলব্ধ হয়।

তপ এমন এক সরল পথ যার দ্বারা ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় ফলে মন বহির্মুখী হওয়ার পরিবর্তে অন্তর্মুখী হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে ও তা নির্মল হয়ে আত্মাকেও নির্মল বানায়।

তপের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাকে বশীভূত করা। নিদ্রার ন্যায় অলসতাকে জয় করে স্বাধ্যায় ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া, আচার্য কুন্দকুন্দের মতে যিনি আহার, নিদ্রা, আসন বিজয়ী হন একমাত্র তিনিই জৈন শাসন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। পঞ্চবৃত্তির কারণে চিত্ত শুদ্ধি হয়না এবং অশুদ্ধ চিত্তে পরমাত্মার সাক্ষাৎ হয়ে ওঠেনা।

তপের মাধ্যমে বিগত জন্মের সঞ্চিত পাপের ক্ষয় হয়। এই তপ রূপী ধর্ম একদিকে যেমন সংযম রক্ষা করে তেমন অপরদিকে আত্মাকে নির্মল করে তুলে সকল মলিনতা দূর করে।

আচারাঙ্গ সূত্রে বলা হয়েছে যে তপ কর্মমল শোধক। যেমনভাবে জল ইত্যাদি শোধক পদার্থ দ্বারা মলিন বস্ত্র ধৌত হওয়ার পর শুদ্ধ হয় ঠিক তেমনই আধ্যাত্মিক তপসাধনার দ্বারা আত্মা জ্ঞানাবরণাদি অষ্টবিধ কর্মমল থেকে মুক্তি লাভ করে।

জহু খলু মইলং বথং সুজ্ঝএ উদগাইএহি দব্বেহি।

এবং ভাবুবহাণেণং সুজ্ঝএ কম্মট্ঠবিহং।।

তপ সম্বন্ধে আরো বলা যায় শ্রমণ সংস্কৃতি হল তপ প্রধান সংস্কৃতি। শ্রমণ শব্দের ব্যুৎপত্তিতেও দেখা যায় তপ শব্দটি। যিনি শ্রম করেন, তপস্যা করেন তিনিই শ্রমণ।

জীবনকে বিকশিত করে তুলতে এবং পরিপূর্ণ করতে তপের প্রয়োজন। তপ দ্বারা অন্তরে যে অসীম শক্তির স্ফুরণ ঘটে তার দ্বারা জীবন পূর্ণতা লাভ করে। তপকে সূক্ষ্ম রূপে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

তপের ভেদ- আত্মশুদ্ধিতার জন্য যে কোন গ্রহণযোগ্য প্রবৃত্তিই তপ হতে পারে। তা সত্ত্বেও জৈনদর্শনানুসারে তপের দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। বাহ্য তপ এবং আভ্যন্তর তপ। সা তবো দুবিহো বুতো- বাহিরব্ভন্তরো তহা।।[৮]

বাহ্য তপ- যে তপে শারীরিক প্রযত্ন প্রধান হয়ে থাকে সেটি বাহ্য তপ। সমবায়াংগ সূত্র অনুযায়ী বৃত্তিকার অভয়দেবসূরী কর্ম ক্ষয় হেতু শরীরের কষ্ট কে বাহ্য তপ বলেছেন।

বাহ্য তপঃ – বাহ্যশরীরস্য পারিশোষণেন কর্মক্ষপণহেতুত্বাদিতি।।[৯]

এই বাহ্য তপের ছয়টি ভেদ- ১) অনশন তপ, ২) ঊনোদরী তপ, ৩) ভিক্ষাচর্য তপ, ৪) রসপরিত্যাগ তপ, ৫) কায়ক্লেশ তপ, ৬) প্রতিসংলীনতা তপ।[১০]

১) অনশন তপ- অনশন অর্থাৎ আহার পরিত্যাগ- আহারস্তৎপরিত্যাগোঽনশনম্।।[১১] সমণসুত্ত অনুযায়ী কর্মগুলির নির্জরা নিমিত্ত এক বা দুই দিন প্রামাণ্য হিসাবে আহার পরিত্যাগ অনশন তপ।।[১২] জৈন তত্ত্ব কালিকা[১৩] এবং লাটী সংহিতা[১৪] এই অনশন তপ কে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছে। অশন শব্দ দ্বারা গৃহীত চার প্রকার বস্তুর ত্যাগ অনশন তপ। এই চার প্রকার বস্তু হল অশন বা অন্ন, পান বা জলাদি পানীয়, খাদ্য বা পক্বান্ন, মিষ্টদ্রব্য এবং স্বাদ্য বা মুখশুদ্ধি। পান ব্যতীত অন্য তিনটি বস্তুর পরিত্যাগ ও এইপ্রকার তপ। গীতায় কথিত অনশনকারী ব্যক্তি মনোবিকারহীন হয়ে যান।[১৫] ব্যকরণগত বিচারে নঞ্ + অশন্ + ল্যুট্ = অনশন > উপবাস করা।[১৬] এই অনশন তপ দুই প্রকার- ক) ইত্বরিক অনশন অর্থাৎ নির্দিষ্ট কাল যাবৎ এবং খ) যাবৎকথিত অনশন অর্থাৎ আজীবন।

ক) ইত্বরিক অনশন- তত্ত্বার্থসূত্রের টীকায় বলা হয়েছে-

চতুর্থ ভক্তাদি তু ভাষ্যকারেণোপণ্যস্তমতীত্বররত্বাদিত রদুপেক্ষিতম্ চতুর্থভক্তাদি ষণ্মাসপর্যবসানমিত্বরমনশনং।।[১৭]

অর্থাৎ- চতুর্থ ভক্ত থেকে ছমাস পর্যন্ত উপবাস হল ইত্বরিক অনশন। উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে ইত্বরিক অনশন ছয় প্রকার বলা হয়েছে- ক) শ্রেণীতপ, ২) প্রতরতপ, ৩) ধনতপ, ৪) বর্গতপ, ৫) বর্গাবর্গতপ, ৬) প্রকীর্ণতপ।[১৮] ইত্বরিক অনশন সাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় এতে ইচ্ছাপূর্বক সময় নির্ধারিত হয়।

খ) যাবৎকথিত অনশন- মারণান্তিক উপসর্গ দেখা দিলে, কঠোর রোগ হলে বা জরাজীর্ণ অবস্থা হলে আয়ু শেষ এমন মনে হলে তখন জীবন পর্যন্ত অনশন যাবৎকথিত তপ। তত্ত্বার্থসূত্রের টীকায় যাবৎকথিত তপ তিনপ্রকার- পাদোপগমন, ইংগিনী এবং ভক্তপ্রত্যাখ্যান তপ।

যাবজ্জীবিকং তু ত্রিবিধং- পাদোপগমনং, ইংগিনীং, ভক্তপ্রত্যাখ্যানমিতি।।[১৯]

২) ঊনোদরী তপ- আহার, জল, বস্ত্র, পাত্র এবং কষায় ইত্যাদিকে কম করা হল ঊনোদরিকা- অল্পত্বমূনোদরিকা।[২০] আগম সাহিত্যে এই ঊনোদরী তপের তিন প্রকার নাম প্রাপ্ত হয়- ঊনোদরিকা,[২১] অবমোদরিকা[২২] এবং অবমৌদর্য।[২৩] সমণসুত্ত অনুযায়ী যে ব্যক্তি যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করবেন, সেই পরিমাণ থেকে এক গ্রাস কম ভোজনই দ্রব্যরূপে ঊনোদরী তপ।

জো জস্স উ আহারো, তত্তো ওমং তু জো করে।
জহন্নেণেগ সিত্থাঈ, এবং দত্তেণ ঊ ভবে।।[২৪]

ঔপপাতিক সূত্র অনুযায়ী এই তপ দুই প্রকার- ক) দ্রব্য ঊনোদরিকা এবং খ) ভাব উনোদরিকা।[২৫]

১) দ্রব্য ঊনোদরিকা- খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যের দ্বারা উদরপূর্তি না করা, খিদের থেকে কম খাওয়া দ্রব্য উনোদরিকা। এই দ্রব্য ঊনোদরিকা আবার দুই প্রকার- উপকরণদ্রব্যঊনোদরিকা এবং ভক্তপানঊনোদরিকা। দব্বোমোয়রিয়া দুবিহা পণ্ণত্তা, তংজহা- উবগরণদব্বোমোয়রিয়া ব ভত্তপাণ দব্বোমোয়রিয়া য।[২৬]

২) ভাব ঊনোদরিকা- আত্ম প্রতিকূল বা আবেশময় ভাবগুলির চিন্তন বিচারে উপযোগ না করা হল ভাব ঊনোদরিকা। ভাব ঊনোদরিকার অনেকগুলি ভেদ- অল্প ক্রোধ, অল্প মান, অল্প মায়া,

অল্প লোভ ইত্যাদি।

ভাবমোয়রিয়া অণেগবিহা পণ্ণত্তা, তংজহা- অপ্পকোহে, অপ্পমাণে, অপ্পমাএ, অপ্পলোহে, অপ্পসদ্দে, অপ্পঝংঝে।[২৭]

এছাড়া, ঊনোদরী তপ স্থানাংগ সূত্র অনুযায়ী তিন প্রকার- ক) উপকরণ অবমোদরিকা, খ) ভক্তপান অবমোদরিকা, গ) ভাব অবমোদরিকা।[২৮] উত্তরাধ্যয়ন সূত্র অনুযায়ী ঊনোদরী তপ পাঁচপ্রকার- ক) দ্রব্য, খ) ক্ষেত্র, গ) কাল, ঘ) ভাব, ঙ) পর্যবচরক।[২৯]

৩)ভিক্ষাচর্য তপ- এইপ্রকার তপ মুনিগণ সম্বন্ধিত। ভিক্ষার জন্য মাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি গৃহে গিয়ে, অমুক দাতা দ্বারা, অমুক পাত্রে রাখা ভিক্ষার গ্রহণ করা হবে এই প্রকার ভিক্ষাচর্যা এই তপ যা বৃত্তিপরিসংখ্যান তপ নামেও উল্লিখিত। সমণসুত্ত অনুযায়ী আহার নিমিত্ত ভিক্ষার্থে কোন সাধু বাইরে বেরোলে তা ঐ সাধুর বৃত্তিপরিসংখ্যান তপ।

গোয়রপমাণদায়গ, ভায়ণণাণাবিধাষাং জং গহণং।
তহ এসণস্য গহণং, বিবিধস্য য বৃত্তিপরিসংখ্যা।। [৩০]

স্থানাংগ সূত্র, উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, ঔপপাতিক সূত্রে ভিক্ষাচরী নাম প্রাপ্ত হলেও সমবায়াংগ সূত্র,[৩১] তত্ত্বার্থসূত্র[৩২] এবং জৈনসিদ্ধান্তদীপিকা গ্রন্থে[৩৩] বৃত্তিসংক্ষেপ, বৃত্তিপরিসংখ্যানতপ বলা হয়েছে। আচারাংগসূত্র,[৩৪] উত্তরাধ্যয়নসূত্র[৩৫] এবং দশবৈকালিকসূত্রে[৩৬] ভিক্ষার্থে গোয়র শব্দ প্রযুক্ত। গোচরী বা ভিক্ষাচরী মধুকরী নামেও পরিচিত।[৩৭]

৪) রসপরিত্যাগ তপ- বিকার উৎপন্ন হয় এমন খাদ্যরাজি যথা – দুধ, দই, ঘি, মিষ্টান্ন, রসযুক্ত খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি পৌষ্টিক খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত হওয়া রসপরিত্যাগ তপ।

খীর দহি সপ্পিমাঈ, পণীয়ং পাণীভোয়ণং।
পরিবজ্জণং রসাণ তু, ভণিয়ং রসবিবজ্জণং।।[৩৮]

স্থানাংগসূত্র অনুযায়ী নয়প্রকার বিকৃতি হল – দুধ, দই, নবনীত, ঘৃত, তেল, গুড়, মধু, মদ, মাংস।[৩৯] ঔপপাতিক সূত্রে রসপরিত্যাগ তপের বিস্তৃত বর্ণনা প্রাপ্ত হয়। এখানে নয় প্রকার ভেদ বলা হয়েছে।[৪০]

ক) নির্বিকৃতি- রস বিকৃতির ত্যাগ নির্বিকৃতিরসপরিত্যাগ তপ।

খ) প্রণীত রসপরিত্যাগ- যে খাদ্যে ঘি থাকে বা অত্যন্ত স্নেহযুক্ত, সেই খাদ্যের ত্যাগ প্রণীতরসপরিত্যাগ তপ।

গ) আচাম্ল- রান্না করা কোন এক প্রকার ধান জলের সাথে গ্রহণ আচাম্ল রসপরিত্যাগ তপ।

ঘ) আয়ামসিক্থ- ধান সিদ্ধ জলের সঙ্গে কিছু অন্ন গ্রহণ আয়ামসিক্থ রসপরিত্যাগ তপ।

ঙ) অরস আহার- রসরহিত ভোজন অরসরসপরিত্যাগ তপ।

চ) বিরস আহার- যে ভোজনের রস শেষ এমন বিস্বাদ ভোজন গ্রহণ বিরসরসপরিত্যাগ তপ।

ছ) অন্য আহার- নীরস আহার, জঘন্য আহার অন্যরসপরিত্যাগ তপ।

জ) প্রান্ত্য আহার- সকল লোকের ভোজন পরবর্তী বাকী ঠাণ্ডা আহার গ্রহণ প্রান্ত্যরসপরিত্যাগ তপ।

ঝ) রূক্ষ আহার- শুকনো খাদ্য রূক্ষ আহার।

শরীরে বিকার উৎপন্নকারী পুষ্টিকর রসময়ী তত্ত্বের সেবন একজন সংযমীর সর্বথা ত্যজ্য।

৫) কায়ক্লেশ তপ- বাহ্য তপের পঞ্চম ভেদ হল কায়ক্লেশ তপ। কায়ক্লেশ শব্দের অর্থ শরীর কে দুঃখ দেওয়া। উত্তরাধ্যয়নসূত্র অনুযায়ী শরীরে বিশেষ স্থিতির জন্য কিছু কঠিন আসন ধারণ কায়ক্লেশ তপ।[৪১] স্থানাংগ সূত্র অনুযায়ী কায়ক্লেশ তপ সাত প্রকার- ১.স্থান আসন, ২.উকড়ু আসন, ৩.প্রতিমা আসন, ৪.বীরাসন, ৫.নিষধা আসন, ৬.দণ্ডায়ত আসন, ৭.লগণ্ডশয়নাসন।[৪২] ঔপপাতিকসূত্র অনুযায়ী কায়ক্লেশ তপ চোদ্দ প্রকার- ১.কায়োৎসর্গ, ২.একস্থানে অবস্থান, ৩.উৎকুট আসন, ৪.প্রতিমা ধারণ, ৫.বীরাসন, ৬.স্থির আসনে বসা, ৭.দণ্ডের ন্যায় শোওয়াবা বসা, ৮.বাঁকা কাঠের ন্যায় শোওয়া, ৯.আতাপনা গ্রহণ, ১০.বস্ত্রাদির পরিত্যাগ, ১১.না চুলকানো, ১২.থুতু না ফেলা, ১৩.পরিকর্মরহিত, ১৪.সজ্জারহিত।[৪৩]

৬) প্রতিসংলীনতা তপ- বাহ্য তপের ষষ্ঠ ভেদ প্রতিসংলীনতা তপ। প্রতিসংলীনতা শব্দের অর্থ সংকোচ। অসদ্ বৃত্তি থেকে ইন্দ্রিয় কে সরানো, মনের নিগ্রহ, সদ্বৃত্তি এবং শুভকাজে ইন্দ্রিয়ভোগ হল প্রতিসংলীনতা তপ। উত্তরাধ্যয়নসূত্র অনুযায়ী এই তপের অপর নাম বিবিক্তশয়নাসন।

এগতমণাবাএ, ইত্থী পসুবিবজ্জিএ।
সয়ণাসণ সেবণয়া, বিবিত্তসয়ণাসণং।।[৪৪]

এই তপ চার প্রকার।[৪৫]

ক) ইন্দ্রিয় প্রতিসংলীনতা তপ- রাগদ্বেষ উৎপন্নকারী শব্দ শ্রবণ থেকে কানকে বাধা দেওয়া, বিকারজনক রূপ দেখতে চোখ কে বাধা দেওয়া, গন্ধ থেকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাক কে, রস আস্বাদন থেকে জিভ ও স্পর্শ থেকে ত্বক কে বাধা দেওয়া ইন্দ্রিয় প্রতিসংলীনতা তপ।

খ) কষায় প্রতিসংলীনতা তপ- কষায় ব্যক্তিকে বিবেকভ্রষ্ট করে তোলে। ক্ষমা থেকে ক্রোধ, বিনয় থেকে মান, সারল্য থেকে মায়া, সন্তোষ থেকে লোভের নিগ্রহ হল কষায় প্রতিসংলীনতা তপ।[৪৬]

গ) যোগ প্রতিসংলীনতা তপ- অসত্য এবং মিশ্র মন - বচনের ত্যাগ করে সত্য – মন – বচন তথা ব্যবহার মন – বচন যোগগুলির যথোচিত প্রয়োগ করা তথা সাতটি কায়যোগ কে অশুভ থেকে নিবৃত্ত করে শুভ তে প্রবৃত্ত করা যোগ প্রতিসংলীনতা তপ।

ঘ) বিবিক্তশয়নাসন তপ- বাড়ি, বাগান অথবা দেবস্থান, হাট, দোকান, অট্টালিকা, গুহা, শ্মশান, কোন বৃক্ষের নীচে যেখানে স্ত্রী, পশু এবং কোন নপুংসক থাকবে না এমন একান্ত স্থানে ব্রহ্মচর্য রক্ষা ও অভয় ভাবের সাধনা বিবিক্তশয়নাসন তপ।

আভ্যন্তর তপ- যে তপ সাধনা শরীর অপেক্ষা মনের সঙ্গে অত্যধিক সম্পর্কযুক্ত সেইটি আভ্যন্তর তপ। এই সাধনায় কায়িক কষ্ট নেই বললেই চলে। মানসিক একাগ্রতাই মুখ্য। বাহ্য সাধনা অপেক্ষা কল্যাণকর কারণ বাহ্য দ্রব্য গুলির উপেক্ষা হেতু মানসিক একাগ্রতা বৃদ্ধি হয়ে থাকে আভ্যন্তর তপে। বাহ্যদ্রব্যানপেক্ষত্বা- দান্তরং তপ উচ্যতে।।[৪৭] এটিও বাহ্য তপের ন্যায় ছয়প্রকার। ১)প্রায়শ্চিত্ত তপ, ২)বিনয় তপ, ৩)বৈয়াবৃত্য তপ, ৪)স্বাধ্যায় তপ, ৫)ধ্যান তপ, ৬)ব্যুৎসর্গ তপ।

১) প্রায়শ্চিত্ত তপ- আভ্যন্তর তপে প্রায়শ্চিত্ত তপ প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। পাপ শোধনের ক্রিয়াই হল প্রায়শ্চিত্ত এবং পূর্বকৃত দোষগুলির আলোচনাপূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করে আত্মশুদ্ধি ঘটানোই হল প্রায়শ্চিত্ত তপ।

আলোয়ণারিহাঈয়ং, পায়চ্ছিত্তং তু দসবিহং।
জং ভিক্খু বহঈ সম্মং, পায়চ্ছিত্তং তমাহিয়ং।।[৪৮]

যার অন্তর সরল, যিনি পাপভীরু এবং আত্মশুদ্ধিতা ঘটাতে আগ্রহী তিনিই প্রায়শ্চিত্ত তপের যোগ্য। নির্গ্রন্থ প্রবচনে কথিত যে ভুলবশতঃ দোষের নিবারণ বা পাপরূপ কর্মের ছেদন প্রায়শ্চিত্ত তপ।[৪৯] তত্ত্বার্থসূত্রে এর নয়টি ভেদ স্বীকৃত[৫০]-

ক) আলোচনার্হ- নিজ দোষ সরল হৃদয়ে গুরুজনদের নিকট প্রকট করা হল আলোচনা। আ অভিবিধিনা সকল দোষাণাং, লোচনা গুরুপুরতঃ প্রকাশনা আলোচনা।[৫১] জৈনাগমে বলা হয়েছে আলোচনা সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে জাতিসম্পন্ন, কুলসম্পন্ন, বিনয়সম্পন্ন, জ্ঞানসম্পন্ন, দর্শনসম্পন্ন, চারিত্রসম্পন্ন প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত।[৫২] ভগবতীসূত্রাদি আগমে উক্ত যে কৃত পাপের আলোচনা না করলে তা হৃদয়ে শল্যের ন্যায় থাকে এবং যে সময় পর্যন্ত শল্য থাকে ততদিন সাধক আরাধক হয় না।

খ) প্রতিক্রমণার্হ- আহার, বিহার, প্রতিলেখনা বা এইধরণের অন্য ক্রিয়ায় যে অজ্ঞাত দোষ হয় তার জন্য অনুতাপ প্রতিক্রমণ।

গ) তদুভয়ার্হ- দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্তে কাজ করার সময় যদি জেনেশুনে দোষ হয় তবে গুরুর সামনে ঐ দোষের আলোচনা এবং প্রতিক্রমণ হল তদুভয়ার্হ।

ঘ) বিবেকার্হ- অশুদ্ধ, অকল্পনীয় এবং তিনপ্রহরের বেশী থাকা খাদ্য ফেলে দিলে দোষশুদ্ধি হয়। এটি বিবেক প্রায়শ্চিত্ত।

ঙ) ব্যুৎসর্গার্হ- নদী প্রভৃতিকে পার করতে তথা মার্গ প্রভৃতিতে যাওয়ার সময় অসাবধানতায় যদি দোষ হয় তখন কার্যোৎসর্গ করলে ঐ দোষের শুদ্ধি হয়।

চ) তপার্হ- পৃথ্বীকায় আদি সচিত্তের স্পর্শ দ্বারা উৎপন্ন পাপ কে আয়ম্বিল, উপবাস প্রভৃতি তপ দ্বারা নিবারণ তপার্হ।

ছ) ছেদার্হ- উপবাস মার্গের সেবন দ্বারা কারণবশতঃ দোষ উৎপন্নকারীর থেকে পালিত সংযমের থেকে কিছু দিনকম করা ছেদার্হ।

জ) মূলার্হ- ছদ্মস্তেথ শ্রমণ কখনো গুরুতর দোষে দোষী হয়ে পড়ে যার দ্বারা তাঁর চরিত্র বিনষ্ট হয়। এরকম দোষশুদ্ধি আলোচনা, তপ, ছেদ প্রভৃতি দ্বারা হয় না তখন পুনরায় মহাব্রত আরোপিত হয়। নতুন দীক্ষা দেওয়া হয়। মহাব্রত মূল এবং এই মহাব্রতের প্রায়শ্চিত্ত মূলার্হ।

ঝ) অনবস্থাপ্যার্হ- রাগবশতঃ অপরের শরীরে লাঠি দ্বারা আঘাত বা অন্যপ্রকারে আঘাত প্রভৃতি কুৎসিত ক্রিয়ার জন্য সম্প্রদায় থেকে পৃথক করে পুনঃ দুষ্কর তপ এবং নবদীক্ষা দেওয়ার রীতি অনবস্থাপ্যার্হ।

২) বিনয় তপ- আভ্যন্তর তপে এর স্থান দ্বিতীয়। বিশেষ রূপে আট প্রকার কর্মের বিনাশ বিনয়। দশবৈকালিকসূত্রে জিন শাসনকে বিনয় বলা হয়েছে- ধম্মস্স বিণও মূলং।[৫৩] গুরুজনের

আজ্ঞা পালন, তাঁর সমীপে বসে তাঁর কার্য করা তথা তাঁর ইঙ্গিতকে বোঝা বিনয় এবং সেই শিষ্য বিনয়বান।[৫৪] গুরুর আগমনে ভক্তিসহ দাঁড়ানো, নমস্কার করা, আসন দান, গুরুভক্তি সহ শুদ্ধভাবে তাঁর সেবা শুশ্রুষা হল বিনয় তপ।[৫৫] তত্ত্বার্থসূত্র অনুযায়ী জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র এবং উপচার হল বিনয়।[৫৬] সমণসুত্ত অনুযায়ী দর্শন, জ্ঞান, চারিত্র, তপ এবং ঔপচারিক হল বিনয়।[৫৭] আগম শাস্ত্র অনুযায়ী এই বিনয় সাত প্রকার।

ক) জ্ঞানবিনয়- জ্ঞানের প্রতি ভক্তি, বহুমান প্রভৃতি হল জ্ঞানবিনয়। দশবৈকালিকসূত্রে বলা হয়েছে যে গুরুজনের নিকট যদি একটিও পদ শেখা যায়, তার বিনয় এবং সৎকার করা উচিত। জস্সংতিএ ধম্মপযাইং সিক্খে তস্সংতিএ বেণইয়ং পউংজে।[৫৮]

খ) দর্শনবিনয়- সম্যকদৃষ্টি পুরুষের যথাযোগ্য বিনয়, শুশ্রূষা করা দর্শনবিনয়।

গ) চারিত্রবিনয়- চারিত্রনিষ্ঠ মহাত্মাগণের প্রতি বিনয়, তাঁদের যথোচিত সেবা – ভক্তি করা হল চারিত্রবিনয়।

ঘ) মনবিনয়- অশুভ, কর্কশ, কঠোর, ছেদক, ভেদক, পরিতাপকর বিচারগুলি থেকে মনকে সরিয়ে প্রশস্ত, কোমল, দয়াযুক্ত, বৈরাগ্যময় বিচার মনবিনয়।

ঙ) বচনবিনয়- কঠোর, কর্কশ বচনের প্রয়োগ না করে হিত, প্রিয় মধুর বচন বলা হল বচনবিনয়।

চ) কায়বিনয়- শরীরকে অপ্রশস্ত কার্যে প্রযুক্ত না করে প্রশস্ত কার্যে প্রযুক্ত করা হল কায়বিনয়।

ছ) লোকোপচারবিনয়- যে নিজের থেকে সদগুণগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁর প্রতি যোগ্য ব্যবহার যেমন তাঁর সামনে যাওয়া, তাঁর উপস্থিতিতে দাঁড়ানো, আসন দেওয়া, বন্দনা প্রভৃতি লোকোপচারবিনয়।[৫৯]

৩) বৈয়াবৃত্য তপ- সেবাভাব হল বৈয়াবৃত্য। স্থবির মুনিগণের যথোচিত সেবা হল বৈয়াবৃত্য।

আয়রিয়মাঈয়, বেয়াবচ্চিম্মি দসবিহে।
আসেবনং জহাথামং, বেয়াবচ্চং তমাহিয়।।[৬০]

শয্যা, বসতি, আসন, প্রতিলেখন দ্বারা উপকৃত সাধুগণের আহার, ওষধি, বাচনা, বন্দনা প্রভৃতি দ্বারা সেবা শুশ্রূষা হল বৈয়াবৃত্য তপ।[৬১] এই তপ দশপ্রকার।

ক) আচার্য বৈয়াবৃত্য- যিনি স্বয়ং আচার পালন করেন এবং অপরকে দিয়ে করান এমন আচার্যের বৈয়াবৃত্য করা উচিত।

খ) উপাধ্যায় বৈয়াবৃত্য- যিনি আত্মকল্যাণের জন্য শাস্ত্রাধ্যয়ন করান এমন উপাধ্যায়ের বৈয়াবৃত্য তপ।

গ) তপস্বী বৈয়াবৃত্য- যিনি মহোপবাস আদি তপ করেন এমন তপস্বীর সেবা বৈয়াবৃত্য।

ঘ) শৈক্ষ বৈয়াবৃত্য- যে নবদীক্ষিত মুনি শাস্ত্রাধ্যয়নে তৎপর এমন শৈক্ষ মুনির সেবা শৈক্ষ বৈয়াবৃত্য।

ঙ) গ্লান বৈয়াবৃত্য- যে মুনির শরীর রোগাদি দ্বারা পীড়িত তাকে গ্লান বলে। এইপ্রকার গ্লান মুনির সেবা গ্লান বৈয়াবৃত্য।

চ) গণ বৈয়াবৃত্য- বৃদ্ধ মুনিসমূহ হলেন গণ। এঁদের সেবা গণ বৈয়াবৃত্য।

ছ) কুল বৈয়াবৃত্য- একই দীক্ষাচার্যের শিষ্যগণ কুল নামে পরিচিত। এমন কুলের বৈয়াবৃত্য করা উচিত।

জ) সংঘ বৈয়াবৃত্য- সাধু–সাধ্বী, শ্রাবক–শ্রাবিকা রূপ সমুদায় যাঁরা এক ধর্মানুসারী, সেই সমুদায় হল সংঘ। এমন সংঘের সেবা তপ।

ঝ) সাধু বৈয়াবৃত্য- যিনি বাস্তবে সাধু এমন ব্যক্তির সেবা সাধু বৈয়াবৃত্য।

ঞ) সমনোজ্ঞ বৈয়াবৃত্য- সুবক্তা, নানা গুণে সুশোভিত এবং লোকজন দ্বারা প্রশংসিত মুনি সমনোজ্ঞ।এমন ব্যক্তির বৈয়াবৃত্য সমনোজ্ঞ বৈয়াবৃত্য।

৪) স্বাধ্যায় তপ- স্বাধ্যায় অর্থাৎ বিধিপূর্বক সৎ শাস্ত্রগুলির অধ্যয়ন। বিধিপূর্বক আত্মকল্যানকারী সৎ শাস্ত্রগুলির অধ্যয়নই স্বাধ্যায় তপ। স্বাধ্যায় পাঁচপ্রকার। তত্ত্বার্থসূত্র অনুযায়ী এই পাঁচটি ভেদ হল[৬২]-

ক) বাচনা- ফলের অপেক্ষা না করে শাস্ত্র পাঠ, শাস্ত্রের অর্থ করা এবং অন্য জীবগণের জন্য শাস্ত্র এবং অর্থ উভয়ের ব্যাখ্যাই হল বাচনা।

খ) পৃচ্ছনা- পাঠসময়ে অথবা পাঠশেষে শিষ্যের মনে যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়, আচার্যের কাছে তার জিজ্ঞাসা।

গ) পরিবর্তনা- আচার্য থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কে স্মৃতিতে রাখার জন্য তার বার বার আবৃত্তি।

ঘ) অনুপ্রেক্ষা- জ্ঞাত অর্থের একাগ্র মনে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস, চিন্তন অনুপ্রেক্ষা।

ঙ) ধর্মোপদেশ- অসংযম নিবারণের জন্য, মিথ্যাত্ব কে দূর করার জন্য পঠিত এবং পর্যালোচিত শ্রুতের উপদেশ।

৫) ধ্যান তপ- তত্ত্বার্থসূত্রে বলা হয়েছে উত্তম সংহননকারী জীবের কোন এক আলম্বনে মনকে স্থির করা তথা মন- বচন- কায়ের নিরোধ হল ধ্যান।

উত্তমসংহননস্যৈকাগ্রচিন্তানিরোধো ধ্যানম্। আমুহূর্তাৎ।।[৬৩]

উত্তম ধ্যানের সময় অন্তর্মুহূর্ত কারণ এর থেকে অধিক সময় ধ্যান হয়না। জৈনসিদ্ধান্তদীপিকা অনুযায়ী কোন এক আলম্বনে মন কে স্থির করা তথা মন-বচন–কায়ের নিরোধ হল ধ্যান। একাগ্রে মনঃসন্নিবেশনং যোগনিরোধো বা ধ্যানম্।।[৬৪]

তত্ত্বার্থসূত্রে এর চারটি ভেদ স্বীকৃত –আর্ত্তরৌদ্রধর্মশুক্লানি[৬৫] অর্থাৎ আর্ত্ত, রৌদ্র, ধর্ম এবং শুক্ল ধ্যান। জৈন সিদ্ধান্ত দীপিকা অনুযায়ী দুইপ্রকার- ধর্ম্য এবং শুক্ল –ধর্ম্যশুক্লে।[৬৬]

ক) আর্ত্ত ধ্যান- চেতনার বেদনাময় একাগ্র পরিণতিকে আর্ত্ত ধ্যান বলা হয়।

খ) রৌদ্র ধ্যান- চেতনার ক্রূরতাময় একাগ্র পরিণতি রৌদ্র ধ্যান।

গ) ধর্ম ধ্যান- বস্তু ধর্ম এবং সত্যের গবেষণায় পরিণত চেতনার একাগ্রতাকে ধর্ম ধ্যান বলা হয়। জৈন সিদ্ধান্ত দীক্ষিত অনুযায়ী আজ্ঞা, অপায়, বিপাক এবং সংস্থানের বিচয় করার জন্য যে ধ্যান করা হয় সেটি ধর্ম ধ্যান।

আজ্ঞা-অপায়-বিপাক-সংস্থান-বিচয়ায় ধর্ম্যম্।।[৬৭]

ঘ) শুক্ল ধ্যান- যে ধ্যানে আত্মার কর্মরূপী মল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় শুদ্ধতা অর্থাৎ শুক্লতা প্রাপ্ত হয়, সেটি শুক্লধ্যান।

শুচি যোগাচ্ছুক্লম্।[৬৮]

৬) ব্যুৎসর্গ তপ- ব্যুৎসর্গ তপ বা কায়োৎসর্গ তপ আভ্যন্তর তপের ষষ্ঠ ভেদ। বিশেষ রূপে উৎসর্গই ব্যুৎসর্গ তপ। আচার্য অকলংকের মতে নিঃসঙ্গতা, অনাসক্তি, নির্ভয়তা এবং জীবনের লালসার পরিত্যাগই ব্যুৎসর্গ তপের মূল ভিত্তি। আত্মসাধনার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়াই এই তপ।

নিসংগনির্ভয়ত্ব জীবিতাশাব্যুদাসাদ্যর্থো ব্যুৎসর্গঃ।।[৬৯]

এই তপ দুই প্রকার-

ক) বাহ্যোপধি ব্যুৎসর্গ- ধন, ধান, গৃহ প্রভৃতি বাহ্য পদার্থগুলির মমতা ত্যাগ বাহ্যোপধি ব্যুৎসর্গ।

খ) আভ্যন্তরোপধি ব্যুৎসর্গ- শরীরের মমতা এবং কাষায়িক বিকার গুলির তন্ময়তার ত্যাগ আভ্যন্তরোপধি ব্যুৎসর্গ।[৭০]

এইপ্রকার তপ দ্বারা বদ্ধ কর্মের নির্জরা করে অক্ষয় জ্ঞান বা কৈবল্য অর্থাৎ অরিহন্তত্ব রূপ পদের লাভ হয়।

পাদটীকা

১. স্থা০সূ০, ১০/১৬
২. ধম্মো মংগলমুক্কিষ্ঠং, অহিংসা সংজমো তবো।। দশবৈ০সূ০, ১/১
৩. ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।। ঋগ্০, ১০, ১৯০, ১
৪. মনু০, ১১/১৩৭
৫. সংস্কৃত - হিন্দী কোষ, পৃ.৪২১
৬. তাপয়তি অষ্টপ্রকারকর্মং ইতি তপঃ।। (জিনদাস চূর্ণি) দশবৈ০ পৃ.১৫
৭. ভবকীড়ো সংচিয়ং কম্মং, তবসা ণিজ্জরিজ্জই।। উত্তরা০সূ০, ৩০/৬
৮. ঐ, ৩০/৭
৯. সম০, বৃত্তি-৬
১০. বাহিরএ তবে ছবিহে পণ্ণত্তে, তংজহা- অণসণং, ওমোওরিয়া, ভিক্খায়রিয়া, রসপরিচ্চাও, কায়কিলেসো, পংডিসংলীণতা।। ভগ০সূ০, ২৫/৭/১০৪
১১. তত্ত্বা০, পৃ.২৩৬
১২. কম্মাণ নিজ্জরট্ঠং, আহারং পরিহরেই লীলাএ। এগদিণাদিপমাণং, তস্স তবং অণসণং হোদি।। সমণ০, ৪৪২
১৩. জৈ০ত০কা০, পৃ.১৫৭
১৪. খাদ্যাদিচতুর্দ্ধাহারসংন্যাসোঽনশনংমতম্।। লাটী০, ৬/৭৬
১৫. বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। শ্রীমদ্ভাগ০, ২/৫৯
১৬. সংস্কৃত - হিন্দী কোষ, পৃ.৩২
১৭. তত্ত্বা০, পৃ.২৩৬
১৮. জো সো ইত্তরিয় তবো, সো সমাসোণ ছব্বিহো। সেটিতবো পয়রতবো, ঘণো য তহ হোই বগ্গো য।। তত্তো য বগ্গবগ্গো, পংচমো ছট্টও পইণ্ণতবো। মণইচ্ছিয়চিত্তত্থো, নায়ব্বো হোই ইত্তরিয়ো।। উত্তরা০সূ০, ৩০/১০-১১
১৯. তত্ত্বা০, পৃ.২৩৭
২০. জৈ০সি০দী, ৬/৩১
২১. উত্তরা০সূ০, ৩০/৮
২২. স্থা০সূ০, ৩/৩/৩৮১
২৩. উত্তরা০সূ০, ৩০/১৪

২৪. সমণ০, ৪৪৮

২৫. ওমোয়রিয়াও দুবিহা পণ্ণত্তা, তংজহা- দব্বোমোয়রিয়া, ভাবমোয়রিয়া য। ঔপ০সূ০, ৩০

২৬. ঔপ০সূ০, ৩০

২৭. ঐ

২৮. তিবিহা ওমোয়রিয়া পণ্ণত্তা, তংজহা- উবগরণো মোয়রিয়া, ভত্তপাণো মোয়রিয়া, ভাবোমোয়রিয়া।। স্থা০সূ০, ৩/৩/৩৮৯

২৯. ওমোয়রণং পংচহা, সমাসেণ বিহাহিয়। দব্বও, খেত্ত, কালেণং, ভাবেণ পজ্জবেহি য।। উত্তরা০সূ০, ৩০/১৪

৩০. সমণ০, ৪৪৯

৩১.সম০সূ০, ৬/১

৩২. ত০সূ০, ৯/১৯

৩৩. নানাভিগ্রহাদ বৃত্যবরোধো বৃত্তিসংক্ষেপঃ।। জৈ০সি০দী, ৬/৩২

৩৪. আ০সূ০, ২/১

৩৫. উত্তরা০সূ০, ৩০/২৫

৩৬. দশবৈ০সূ০, ৫/১/৩

৩৭. ঐ, ১/২-৩

৩৮. উত্তরা০সূ০, ৩০/২৬

৩৯. স্থা০সূ০, ৯২৩

৪০. রসপরিচ্চাএ অণেগবিহে পণ্ণত্তে। তংজহা- নিব্বীইএ, পণীয় রস পরিচ্চাএ
আয়ংবিলিয়, আয়ামসিত্থ ভোজী, অরসাহারে, রিসাহারে, অংতাহারে, পংতাহারে, লুহাহারে।। ঔপ০সূ০,৩০

৪১. ঠাণা বীররাসণাঈয়া, জীবস্স উ সুহাবহা। উগ্গা জহা ধরিজ্জন্তি, কায়কিংলেসং তমাহিয়ং।। উত্তরা০- ৩০/২৭

৪২. স্থা০সূ০, ৭/৫৫৪

৪৩. ঔপ০সূ০, ৩০

৪৪. উত্তরা০সূ০, ৩০/২৮

৪৫. পডিসংলীণয়া চউবিহা পণ্ণত্তা, তংজহা- ইংদিঅপডিসংলীণয়া,
পডিসংলীণয়া, জোগপডিসংলীণয়া, বিবিক্তসয়ণাসণ সেবণয়া।। ভগ০সূ০, ২৫/৭/১১৮

৪৬. দশবৈ০সূ০, ৮/৩৯

৪৭. তত্ত্বা০, ২৪৯

৪৮. উত্তরা০সূ০, ৩০/৩১

৪৯. নি০প্র০, পৃ.৫৮৯

৫০. ত০সূ০, ৯/২২

৫১. ভগ০টীকা, ২৫/৭

৫২. ভগ০সূ০, ২৫/৭, ১০/২

৫৩. দশবৈ০সূ০, ৯/২/২

৫৪. উত্তরা০সূ০, ১/২

৫৫. ঐ, ৩০/৩২

৫৬. ত০সূ০, ৯/২৩

৫৭. সমণ০, ৪৬৪
৫৮. দশবৈ০সূ০, ৯/১/১২
৫৯. ত০সূ০, পৃ.২২০
৬০. উত্তরা০সূ০, ৩০/৩৩
৬১. সেজ্জোগাসণিসেজ্জো, তহোবহিপডিলেহণাদি উবগ্গহিদে।
আহারোসহবায়ণ-বিকিংচণং বংদণাদীহিং।। সমণ০, ৪৭৩
৬২. ত০সূ০, ৯/২৫
৬৩. ত০সূ০, ৯/২৭-২৮
৬৪. জৈ০সি০দী০, ৬/৪১
৬৫. ত০সূ০, ৯/২৯
৬৬. জৈ০সি০দী০, ৬/৪২
৬৭. জৈ০সি০দী০, ৬/৪৩
৬৮. সর্বার্থ০, ৯/৮
৬৯. ত০বা০, ৯/২৬
৭০. (সংঘবী) ত০সূ০, পৃ.২২১

গ্রন্থপঞ্জী

আচারাংগসূত্র, (সং০) যুবাচার্য শ্রী মধুকর মুনি জী ম০, শ্রী আগম প্রকাশন সমিতি, পীপলিয়া বাজার, ব্যাবর, সন ১৯৮০।
উত্তরাধ্যয়নসূত্র, (সং০) উপাধ্যায় শ্রমণ শ্রী ফুলচন্দ্র জী ম০, আচার্য শ্রী আত্মারাম জৈন প্রকাশন সমিতি, জৈন স্থানক, লুধিয়ানা, বি০সং০ ২০৩৯।
ঔপপাতিকসূত্র, (সং০) যুবাচার্য শ্রী মধুকর মুনি জী ম০, শ্রী আগম প্রকাশন সমিতি, পীপলিয়া বাজার, ব্যাবর, সন ১৯৭২।
ঋগ্বেদ সংহিতা, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা- ৭, সন ১৯৭৬।
জৈন তত্ত্ব কালিকা, আচার্য শ্রী আত্মারাম জী ম০, আত্মারাম জ্ঞান পীঠ মানসা, সন ১৯৮২।
তত্ত্বার্থাধিগম ভাষ্য, (সোপজ্ঞবৃত্তি সহিত) আচার্য উমাস্বাতি, (সং০) ব্যাকরণাচার্য পণ্ডিত ঠাকুর প্রসাদ শর্মা, প্রকা০ পরমশ্রুত প্রভাবক মণ্ডল, বম্বঈ, বি০সং০ ১৯৮৯।
তত্ত্বার্থরাজবার্তিক, ভট্টাকলংক দেব, (সং০) পণ্ডিত মহেন্দ্র কুমার জৈন ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রকাশন, কাশী, সন ১৯৪৯।
তত্ত্বার্থসূত্র, (সং০) পণ্ডিত সুখলাল সংঘবী, পার্শ্বনাথ বিদ্যাপীঠ, বারাণসী, সন ২০০৯।
দশবৈকালিকসূত্র, (সং০) যুবাচার্য শ্রী মধুকর মুনি জী ম০, শ্রী আগম প্রকাশন সমিতি, ব্যাবর, সন ১৯৮৫।
নির্গ্রন্থ প্রবচন, শ্রী চৌথমল জী ম০, শ্রী দিবাকর দিব্য জ্যোতি কার্যালয়, ব্যাবর, সন ১৯৬৬।
ভগবতী সূত্র, (সং০) মুনি শ্রী কন্হৈয়া লাল জী, অখিল ভারতীয় শ্বেতাম্বর জৈন শাস্ত্রোদ্ধার সমিতি, রাজকোট, সন ১৯৬৫।
লাটী সংহিতা, শ্রাবকাচার সংগ্রহ-৩, (সং০) পণ্ডিত হীরালাল সিদ্ধান্তালংকার, জৈন সংস্কৃতি সংরক্ষক সংঘ, শোলাপুর, সন ১৯৭৬।
শ্রীমদ্ ভাগবদ্গীতা, মূল, গীতা প্রেস, গোরখপুর, বি০সং০ ২০৩১।
সংস্কৃত হিন্দী কোশ, বামন শিবরাম আপ্টে, মোতীলাল বনারসীদাস জৈন, দিল্লী, সন ১৯৭৭।
সমণ সুত্তং, সর্ব সেবা সংঘ প্রকাশন, রাজঘাট বারাণসী, সন ১৯৭৫।

সমবায়াংগ বৃত্তি, আচার্য অভয়দেব সূরি, আগমোদয় সমিতি মেহসাণা, সন ১৯১৮।
সমবায়াংগ সূত্র, (সং০) যুবাচার্য শ্রী মধুকর মুনি, শ্রী আগম প্রকাশন সমিতি, পীপলিয়া বাজার, ব্যাবর।
স্থানাংগ সূত্র, (সং০) যুবাচার্য শ্রী মধুকর মুনি, শ্রী আগম প্রকাশন সমিতি, পীপলিয়া বাজার, ব্যাবর, সন ১৯৮৭।
Illuminator Of Jaina Tenets, Jaina Siddhānta Dīpika by Ācārya Tulsi, translated by Satkari Mookerjee, edited by Nathmal Tatia, Muni Mahendra Kumar, Anekanta sodha-pitha, Jain Vishva Bharati, Ladnun, Rajasthan, 1985.

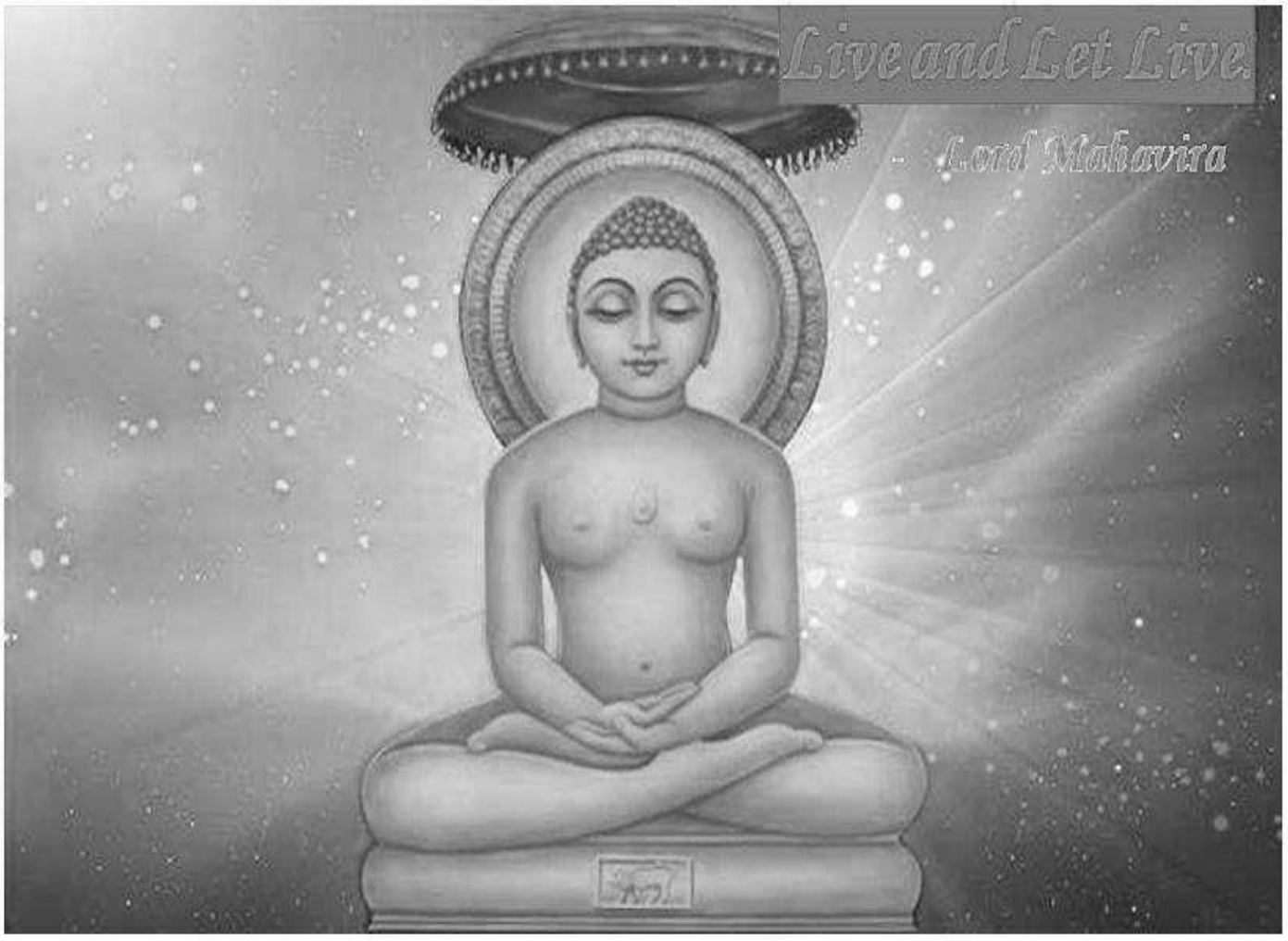

আগম পাঠ : ভগবতী সূত্র

- শ্রীকান্ত জৈন

জৈন আগমগুলিতে তেজোলেশ্যা প্রাপ্তির জন্য বিশিষ্ট সাধনবিধির উল্লেখ আছে। ভগবান মহাবীরের একদা অনুচর গোশালক মহাবীরের কাছে তেজোলেশ্যার সাধনপদ্ধতি শিখে মহাবীর ভগবান এবং তাঁর শিষ্যদের উপরই সেটার অপপ্রয়োগ করেছিলেন এবং এই অপপ্রয়োগই তাঁর নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছিল। তবে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, তেজোলেশ্যা বলতে সাধনার দ্বারা প্রাপ্তব্য এক বিশেষ প্রকার লব্ধিকেই বোঝায়। সেই কারণে তেজোলেশ্যা শব্দটিকে দ্ব্যর্থক বলা যায়; এক অর্থে যেমন এটি এক মানসিক স্তর বোঝায়, অপর অর্থে তেমনই এটি একপ্রকার লব্ধিকে বোঝায়।

অর্হৎ ভগবানের দ্বারা প্রতিপাদিত জ্ঞানের আধারে গণধরগণ চৌদ্দটি শাস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন, যার মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রুতজ্ঞান বিধৃত হয়েছে, সেই চৌদ্দটি শাস্ত্র চতুর্দশ পূর্ব নামে খ্যাত। পূর্বশাস্ত্রগুলির বিশ্লেষণ পদ্ধতি অত্যন্ত কঠিন হওয়ার কারণে শুধুমাত্র অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সাধকরাই তা অনুধাবন তথা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ ছিলেন। সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সাধকসাধিকাদের জ্ঞানলাভের জন্য পরবর্তী কালে অঙ্গ আগমগুলি রচনা করা হয়েছে। শ্রুত এবং আগম সাহিত্যের অনুপম ভাণ্ডার এই চৌদ্দটি পূর্ব। এমন কোনও বিষয় নেই, যার চর্চা পূর্ব সাহিত্যে করা হয় নি। বর্তমানে পূর্ব সাহিত্যকে অঙ্গসাহিত্যের থেকে ভিন্ন বলে গণ্য করা হয় না। বারোটি অঙ্গের মধ্যে দ্বাদশ অঙ্গ হল দৃষ্টিবাদ। দৃষ্টিবাদেরই এক বিভাগ হল 'পূর্বগত' এবং চতুর্দশ পূর্ব এই পূর্বগতেরই অংশ। জৈন অনুশ্রুতি অনুসারে ভগবান মহাবীর সর্বাগ্রে 'পূর্বগত' অর্থ নিরূপণ করেছিলেন এবং সেটাকেই গৌতমাদি গণধরগণ 'পূর্বশ্রুতে'র আকারে রচনা করেছিলেন। কিন্তু পূর্বগত শ্রুত অত্যন্ত গভীর এবং কঠিন ছিল; সাধারণ অধ্যয়নকারীর বোধগম্য ছিল না। এজন্য স্বল্প মেধাবীদের জন্য আচারাঙ্গ, সূত্রকৃতাঙ্গ, ইত্যাদি অন্য অঙ্গগুলি রচিত হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত আচারাঙ্গাদি অঙ্গসাহিত্য রচিত হয় নি, ততদিন পর্যন্ত ভগবান মহাবীরের শ্রুতরাশি চতুর্দশ পূর্ব বা দৃষ্টিবাদ নামে পরিচিত ছিল। যখন অঙ্গসাহিত্যগুলি নির্মিত হল, তখন, দৃষ্টিবাদকে দ্বাদশ অঙ্গ হিসেবে অঙ্গ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হল। আগম সাহিত্যে দ্বাদশাঙ্গপাঠী এবং চতুর্দশপূর্বপাঠী – দু'রকম সাধকেরই বর্ণনা মেলে;

কিন্তু উভয়ের তাৎপর্য একই। যিনি চতুর্দশপূর্বী হন, তিনি দ্বাদশাঙ্গবিদ্‌ও হন, কেননা দ্বাদশ অঙ্গের মধ্যেই নিহিত আছে চতুর্দশ পূর্ব। এই চৌদ্দটি পূর্ব হল, উৎপাদপূর্ব, অগ্রায়ণীয়, বীর্যপ্রবাদ, অস্তিনাস্তিপ্রবাদ, জ্ঞানপ্রবাদ, সত্যপ্রবাদ, আত্মপ্রবাদ, কর্মপ্রবাদ, প্রত্যাখ্যান, বীর্যানুবাদ, কল্যাণবাদ, প্রাণাবাদ, ক্রিয়াবিশাল, লোকবিন্দুসার।

এরপর আসা যাক চার প্রকার জ্ঞানের বিষয়ে। জৈন দর্শনে পাঁচ প্রকার জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এই চার প্রকার জ্ঞান হল – মতিজ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান, অবধিজ্ঞান, মনঃপর্যব জ্ঞান, এবং কেবলজ্ঞান। পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মনের সহায়তায় যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাঁকে বলা হয় মতিজ্ঞান। শাস্ত্রশ্রবণ, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা যায়, তাঁকে শ্রুতজ্ঞান বলায় হয়। ইন্দ্রিয় এবং মনের সাহায্য ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সমস্ত মূর্ত পদার্থের যে জ্ঞান, তার নাম অবধি জ্ঞান। অন্যের মনের কথা জানি হল মনঃপর্যায় জ্ঞান। এবং সর্বকালের সর্বস্থানের সমস্ত পদার্থকে তাদের পর্যায়সহ জানা যায় যে জ্ঞান দ্বারা, তাঁকে বলা হয় কেবলজ্ঞান। এই জ্ঞানই সর্বোচ্চ তথা পরমতম জ্ঞান। কেবলজ্ঞান অর্জন করতে পারলে মানুষ সর্বজ্ঞ হয়ে যায়। এদের মধ্যে প্রথম দুই প্রকার জ্ঞান হল পরোক্ষ জ্ঞান এবং শেষ তিনটি জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। গণধর গৌতমস্বামী তখনও পর্যন্ত প্রথম চারটি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন; পরে তিন কেবলজ্ঞানও অর্জন করবেন।

এবার আমরা পরবর্তী সূত্রের আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি।

(সূত্র ৪/৪)

তহ ণং সে ভগবং গোয়মে জায়সড্ঢে জায়সংসএ জায়কোঊহল্লে উপ্পন্নসড্ঢে উপ্পন্নসংসএ উপ্পন্নকোঊহলে সংজায়সড্ঢে সংজায়সংসএ সংজায়কোঊহল্লে সমুপ্পন্নসড্ঢে সমুপ্পন্নসংসএ সমুপ্পন্নকোঊহল্লে ঊট্ঠাএ উট্ঠেতি।

ঊট্ঠাএ উট্ঠেতা জেণেব সমণে ভগবং মহাবীরে তেণেব উবাগচ্ছই উবাগচ্ছিতা সমণং ভগবং মহাবীরং তিক্খুত্তো আয়াহিণং পয়াহিণং করেতি। তিক্খুত্তো আয়াহিণং পয়াহিণং করেত্তা বংদেতি নমংসতি নচ্চাসনে নাইদূরে অভিমুহে বিণয়েণং পংযলিয়ডে পজ্জুবাসমানে এবং বয়াসী-

-:শব্দশঃ অর্থ:-

তহ (তথা; তখন) ণং সে (তিনি) ভগবং গোয়মে (ভগবান গৌতম) জায়সড্ঢে (জাতশ্রদ্ধ; যার মনে শ্রদ্ধা জন্মেছে) জায়সংসএ (জাতসংশয়; যার মনে সংযম জেগেছে) জায়কোঊহল্লে (জাত-কৌতূহল; যার মনে কৌতূহল জেগেছে) উপ্পন্নসড্ঢে (উতপন্ন-শ্রদ্ধ; যার মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়েছে) উপ্পন্নসংসএ (উৎপন্ন-সংশয়; যার মনে সংশয় উৎপন্ন হয়েছে) উপ্পন্নকোঊহলে (উৎপন্ন-কৌতূহল; যার মনে কৌতূহল উৎপন্ন হয়েছে) সংজায়সড্ঢে (সংজাতশ্রদ্ধ; যার মনে সম্যকরূপে শ্রদ্ধা জন্মেছে) সংজায়সংসএ (সংজাতসংশয়; যার মনে সম্যকরূপে সংযম জেগেছে) সংজায়কোঊহল্লে (সংজাত-কৌতূহল; যার মনে সম্যকরূপে কৌতূহল জেগেছে) সমুপ্পন্নসড্ঢে (সমুৎপন্ন-শ্রদ্ধ; যার মনে সম্যকরূপে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়েছে) সমুপ্পন্নসংসএ (সমুৎপন্ন-সংশয়; যার মনে সম্যকরূপে সংশয় উৎপন্ন হয়েছে) সমুপ্পন্নকোঊহল্লে (সমুৎপন্ন-কৌতূহল; যার মনে সম্যকরূপে কৌতূহল উৎপন্ন হয়েছে) ঊট্ঠাএ (উত্থায়; উঠে) উট্ঠেতি (উঠলেন; দাঁড়ালেন)।

ঊট্ঠাএ উট্ঠেতা (উঠে দাঁড়িয়ে) জেণেব (যেদিকে) সমণে (শ্রমণ) ভগবং (ভগবান) মহাবীরে (মহাবীর) তেণেব (সেইদিকে) উবাগচ্ছই (যান) উবাগচ্ছিতা (গিয়ে) সমণং ভগবং মহাবীরং (শ্রমণ ভগবান মহাবীরকে) তিক্খুত্তো আয়াহিণং পয়াহিণং করেতি (তিক্খুত্তো আয়াহিণং পয়াহিণং করেন)। তিক্খুত্তো (তিনবার) আয়াহিণং (আদক্ষিণ; দক্ষিণ দিক থেকে) পয়াহিণং (প্রদক্ষিণ) করেত্তা (দক্ষিণ দিক থেকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে) বংদেতি (বন্দনা করেন) নমংসতি (নমস্কার করেন) নচ্চাসনে (নাত্যাসন্ন; অতি নিকটে নয়) নাইদূরে (নাতিদূরে; খুব দূরে নয়) অভিমুহে (অভিমুখে) বিণয়েণং (বিনয়ের সাথে) পংযলিয়ডে (প্রাঞ্জলি করেন; হাত জোড় করেন) পজ্জুবাসমানে (পর্যুপাসনা করতে করতে) এবং (এইরূপ) বয়াসী (বলেন)-

-:সরলার্থ:-

তখন জাতশ্রদ্ধ, জাতসংশয়, জাত-কৌতূহল, উৎপন্ন-শ্রদ্ধ, উৎপন্ন-সংশয়, উৎপন্ন-কৌতূহল, সংজাতশ্রদ্ধ, সংজাতসংশয়, সংজাত-কৌতূহল, সমুৎপন্ন-শ্রদ্ধ, সমুৎপন্ন-সংশয় এবং

সমুৎপন্ন-কৌতূহল সেই ভগবান গৌতমস্বামী উঠে দাঁড়ান। উঠে দাঁড়িয়ে যেখানে শ্রমণ ভগবান মহাবীর রয়েছেন, সেদিকে যান। গিয়ে শ্রমণ ভগবান মহাবীরকে দক্ষিণ দিক থেকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে করেন। প্রদক্ষিণ করার পর তাঁকে বন্দন ও নমস্কার করেন এবং অনতিদূরে ও অনতিসন্নিকটে গিয়ে বিনয়ের সাথে কৃতাঞ্জলিপুটে পর্যুপাসনা করতে করতে তাঁকে এইরূপ বলেন, -

গণধর গৌতম স্বামী ভগবান মহাবীরকে কী বলেন, তা আমরা পরের সূত্রে দেখতে পাব। এখানে বিশেষভাবে যেটা চোখে পড়ে, সেটা হল, গৌতম স্বামীর বর্ণনা দিতে গিয়ে জাত, উৎপন্ন এবং সংজাত – এই তিনটি বিশেষণ এবং শ্রদ্ধা, শংশয় এবং কৌতূহল এই তিনটি বিশেষ্য পদ মিলিয়ে মোট ন'টি বিশেষণ তাঁর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই বিশেষণগুলির চুলচেরা বিশ্লেষণে আমাদের কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সাধারণভাবে মহাবীর স্বামীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার, তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর সংশয়ের এবং মহাবীর স্বামীর কাছ থেকে তাঁর যাবতীয় সংশয়ের সমাধান প্রাপ্তির কৌতূহলের গভীরতার কথাই এই নয়টি বিশেষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে বলে আমরা ধরে নেব। পঞ্চম সূত্রে এবার আমরা দেখতে পাব তীর্থংকর মহাবীরের উদ্দেশ্যে তাঁর ভক্তি ও বিনয়মিশ্রিত প্রশ্ন।

(সূত্র ৫/১)

সে নূণং ভন্তে*! চলমানে চলিতে? উদীরিজ্জমাণে উদীরিতে? বেইজ্জমাণে বেইএ? পহিজ্জমাণে পহীণে? ছিজ্জমাণে ছিন্নে? ভিজ্জমাণে ভিন্নে? ডজ্ঝমাণে ডড্ঢে? মিজ্জমাণে মডে? নিজ্জরিজ্জমাণে নিজ্জিণ্ণে?

হংতা গোয়মা! চলমাণে চলিএ জাব নিজ্জরিজ্জমাণে নিজ্জিণ্ণে।

-:শব্দশঃ অর্থ:-

সে (এটা) নূণং (প্রশ্ন সূচক অব্যয়) ভন্তে* (ভগবান) ! চলমানে (চলমান; যেটা চলছে) চলিতে (চলিত; চলে গেছে))? উদীরিজ্জমাণে (যে কর্মের* উদীর্ণা* হচ্ছে) উদীরিতে (উদীর্ণ হয়ে

গেছে)? বেইজ্জমাণে (যে কর্মের বেদন অর্থাৎ ভোগ হচ্ছে) বেইএ (বেদিত হয়ে গেছে)? পহিজ্জমাণে (যেটা পতিত হচ্ছে) পহীণে (পতিত হয়েছে)? ছিজ্জমাণে (যা ছিন্ন হচ্ছে) ছিন্নে (ছিন্ন হয়ে গেছে)? ভিজ্জমাণে (যা ভিন্ন হচ্ছে অর্থাৎ যাকে ভেদ করা হচ্ছে) ভিন্নে (ভিন্ন হয়ে গেছে)? ডজ্ঝমাণে (দাহ্যমান অর্থাৎ যাকে দহন করা হচ্ছে) ডড্ঢে (দগ্ধ)? মিজ্জমাণে (ম্রিয়মাণ; অর্থাৎ যার মৃত্যু হচ্ছে) মডে (মৃত)? নিজ্জরিজ্জমাণে (যে কর্মের নির্জরা হচ্ছে) নিজ্জিণ্ণে (নির্জীর্ণ)?

হংতা (হ্যাঁ) গোয়মা (গৌতম)! চলমাণে (চলমান) চলিএ (চলিত) জাব (যাবৎ) নিজ্জরিজ্জমাণে (নির্জরমান) নিজ্জিণ্ণে(নির্জীর্ণ)।

-:সরলার্থ:-

হে ভগবান! এটা কি ঠিক যে, চলমান মানেই চলিত, উদীর্ণমান মানেই উদীর্ণ, বেদ্যমান মানেই বেদিত, পতনশীল মানেই পতিত, ছিন্নমান মানেই ছিন্ন, ভেদ্যমান মানেই ভিন্ন, দাহ্যমান মানেই দগ্ধ, ম্রিয়মাণ মানেই মৃত, নির্জরমান (কর্ম) মানেই নির্জীর্ণ?

এই প্রশ্নগুলির মধ্য দিয়ে গৌতম স্বামী জানতে চাইলেন, যা কিছু ঘটছে, সেগুলিকে কি ঘটে গেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে? যেমন, যে মারা যাচ্ছে, তাঁকে কি মৃত বলা যায়? এককথায়, যে কাজ শুরু হয়ে গেছে, সেই কাজ কি সম্পন্নও হয়ে গেছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি? এর উত্তরে ভগবান মহাবীর যা বললেন, তা আমাদের বিস্মিত করতে পারে। তিনি বললেন- **হ্যাঁ, গৌতম! যা চলছে, তার চলা হয়ে গেছে, যাবৎ, যে কর্মের নির্জরা হচ্ছে সেটা নির্জীর্ণ হয়েছে।** এখানে জাব অর্থাৎ যাবৎ শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'চলমান' থেকে 'নির্জীর্ণ' পর্যন্ত যে সমস্ত প্রশ্ন গৌতমস্বামী করেছিলেন, সবগুলিরই ইতিবাচক উত্তর এই শব্দের মধ্যে ধরা আছে; কেবলমাত্র প্রথম এবং অন্তিম প্রশ্নের উত্তরই যে ভগবান মহাবীর দিয়েছেন, সেটা কিন্তু নয়।

জৈন চেতনায় দীপাবলী

- সুখময় মাজী

ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক শাশ্বত ও সর্বজনীন পর্ব দীপাবলী। ভারতবর্ষে উদ্ভূত সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের সাথেই রয়েছে এই উৎসবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। স্বভাবতঃই দিনটি সমস্ত সম্প্রদায়ের নিকটই পবিত্র। বৈদিক সংস্কৃতির অনুসারীরা বলেন, দশেরার দিন রাবণ বধ করে সীতাদেবীকে নিয়ে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র আজকের দিনেই অযোধ্যায় ফিরে আসেন। সেদিন সমস্ত অযোধ্যাবাসী অযোধ্যা নগরীকে দীপমালায় সুশোভিত করে তুলেছিল তাঁদের প্রাণপ্রিয় রঘুনাথকে অত্যন্ত সাদরে বরণ করে নিতে। সেই দিনটির স্মরণেই প্রতি বছর এই তিথিতে দীপাবলী উৎসব পালন করা হয়। সেই হিসেবে এই উৎসবের উৎপত্তি ত্রেতাযুগে। আর্যসমাজীরা আর্যসমাজের সংস্থাপক আচার্য দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রয়াণদিবস হিসেবে দিনটি পালন করেন।

শিখ সম্প্রদায়ের কাছেও দীপাবলী একটি পবিত্র দিন। শিখদের প্রধান উৎসব 'বৈশাখী'; তারপরই দ্বিতীয় মুখ্য উৎসব 'দীপাবলী'। ১৫৭৭ সালের এই দিনই অমৃতসরের সুবিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরের শিলান্যাস হয়। এই দিনই কেন অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের শিলান্যাস হল, তার কারণ খুঁজতে গেলে এটাই মনে হয় যে, ঐ সম্প্রদায়ের কাছে পরম্পরাগত ভাবেই দীপাবলী পবিত্র তিথি হিসেবে পরিগণিত হত। ১৬১৯ সালের এই দিনেই শিখ ধর্মের ষষ্ঠ গুরু গোবিন্দ সিংহ সম্রাট জাহাঙ্গীরের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে অমৃতসর পৌঁছান। গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে নিজের মুক্তির সাথে সাথে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে কারারুদ্ধ ৫২ জন হিন্দু রাজাকেও মুক্ত করেন। তাঁর প্রত্যাবর্তন উদযাপনের জন্য হরমন্দর সাহিব অর্থাৎ স্বর্ণমন্দিরকে শত শত প্রদীপের মালায় সজ্জিত করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই শিখ সম্প্রদায়ে মানুষরা এই দিনটিতে প্রভূত হর্ষোল্লাসের সঙ্গে দীপাবলী উৎসব পালন করেন। এই ঘটনার স্মরণে শিখরা এই দিনটি 'বন্দী ছোড় দিবস' হিসেবে পালন করে। আবার, ১৬৯৯ সালে দীপাবলী র দিনই গুরু গোবিন্দ সিংহের দ্বারা খালসা পন্থের প্রতিষ্ঠা হয়। দীপাবলী র সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও সম্পর্কিত, যা শিখ ইতিহাসের এক মহান আত্মত্যাগকে সূচিত করে। প্রবীণ শিখ বিদ্বান ভাই মণি সিংহ ছিলেন অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের গ্রন্থী অর্থাৎ গুরু

গ্রন্থ সাহেবের বাচক। গুরু গ্রন্থ সাহেবের যে সংস্করণ আজ প্রচলিত, সেটা তিনিই ১৭০৪ সালে সংকলন করেন। ১৭৩৭ সালে তিনি ৫০০০ টাকা খাজনার বিনিময়ে দীপাবলীর দিন 'বন্দী মুক্তি দিবস' পালনের জন্য মুঘল গভর্নর জাকারিয়া খাঁ'র কাছ থেকে অনুমতি আদায় করেন। সমস্ত লোক জমায়েত হলে ৫০০০ টাকা সংগ্রহ হওয়া অসম্ভব ছিল না। এদিকে জাকারিয়া খাঁ ঐ সভায় আগত শিখদের একসাথে হত্যা করার এক ষড়যন্ত্র রচনা করেন। কোনোভাবে এই খবর পেয়ে যান ভাই মণি সিংহ। তখন উনি সকলকে এই সভায় না আসার বার্তা পাঠিয়ে দেন। সকলে রক্ষা পেয়ে যায়, কিন্তু প্রতিশ্রুত ৫০০০ টাকা দিতে না পারায় জাকারিয়া খাঁ মণি সিংহকে বন্দী করে লাহোরে তাঁকে ফাঁসীতে চড়ান। তাই বন্দীমুক্তি দিবসের সাথে সাথে এই দিনটি শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ ভাই মণি সিংহের আত্মোৎসর্গ দিবস হিসেবেও স্মরণ করেন।

বুদ্ধের উপাসকদের কাছেও এই দিনটি উৎসবের দিন। বৌদ্ধ মান্যতা অনুযায়ী সিদ্ধার্থ থেকে বুদ্ধ হয়ে গৃহত্যাগের ১৮ বছর পর ভগবান বুদ্ধ এই দিন কপিলাবস্তু নগরে পদার্পণ করেন। কথিত আছে যে, এই দীপাবলী র দিনই বুদ্ধের প্রিয় সাথী অর্হন্ত মৌগল্যায়ন নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আজও দীপাবলীর দিন বৌদ্ধ স্তুপসমূহে অজস্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করা হয়। বৌদ্ধদের অনেকে দীপাবলী কে সম্রাট অশোকের সাথে সম্পর্কিত বলেও মনে করেন। তাঁদের মতে সম্রাট অশোক নাকি এই দিনই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিণত হয়েছিলেন। সেই উপলক্ষেই সম্রাট ও সমস্ত নগরবাসী সারা নগর আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন। কিন্তু এই ধারণা অবিতর্কিত নয়। বৌদ্ধ গ্রন্থ 'দীপবংশে' দুই জায়গায় নগরবাসীদের দ্বারা দীপমালা রচনার উল্লেখ মেলে। প্রথমবার যখন অশোক সঙ্ঘে দীক্ষিত হন, আর দ্বিতীয়বার, যখন দেবানাং প্রিয় অশোকের কাছে দেবানাং প্রিয় তিষ্য সাক্ষাৎ করতে আসেন। অশোকের দীক্ষার তিথি বা নক্ষত্রের কোনো উল্লেখ ঐ গ্রন্থে নেই এবং রাত্রিবেলায় দীপ প্রজ্জ্বলনের কোনও উল্লেখও সেখানে নেই। বরং এটা উল্লিখিত আছে যে, দিনের বেলায়ই পুরবাসীগণ প্রজ্জ্বলিত দীপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। এই প্রসঙ্গে দীপবংশের উল্লেখটি এই প্রকার, "**দিবা দীপং জলমানং অভিহরন্তু মহাজনা। যাবতা ময়া আনত্তা তায়তা অভিহরন্তু তে**"।। তিষ্য যখন অশোকের সাথে দেখা করতে আসেন, তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে স্তূপ পূজন এবং প্রদীপ দ্বারা স্তূপ সজ্জার আয়োজন করা হয়। কিন্তু সেই দিনটি অমাবস্যা ছিল না বরং সেদিন ছিল পূর্ণিমা। "**চাতুমাসং কোমুদিয়ং**

দিবসং পুন্নরত্তিয়া। আগতো চ মহাবীরো গজকুম্ভে পতিট্ঠিতো"।। অর্থাৎ চাতুর্মাসের পূর্ণিমার দিন সেই মহাবলী রাজা নিজ হস্তীপৃষ্ঠে আসীন হয়ে পাটলিপুত্রে আসেন। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ক্ষত্রিয়গণ উত্তম স্তূপের পূজন করেন এবং বিভিন্ন ধাতু ও রত্ননির্মিত দীপ দ্বারা স্তূপকে সজ্জিত করেন – **"পচ্চেকপূজং চাকংসু খত্তিয়া থূপমুত্তমং। বররতন সংচ্ছত্রং ধাতুদীপং বরুত্তমং"**।। সেই হিসেবে দীপাবলী তো অমাবস্যায় নয়, পূর্ণিমায় মানানোর কথা। যাই হোক, এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে না এসে বিষয়টি পাঠকের বিবেচনার জন্য ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন।

জৈন ধর্মে কিন্তু দীপাবলী এক অত্যন্ত পবিত্র উৎসব। এই দিন বর্তমান অবসর্পিণির চব্বিশতম তথা অন্তিম তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর অবশিষ্ট চার অঘাতী কর্মকে নাশ করে নির্বাণ লাভ করেন। খ্রিস্টজন্মের 527 বছর আগে, কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথির শেষে অমাবস্যার প্রারম্ভে স্বাতী নক্ষত্রের যোগে তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর বিহার প্রদেশের পাবাপুরী নামক স্থানে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। তাই জৈন মান্যতায় দীপাবলী উৎসব ভগবান মহাবীরের নির্বাণ কল্যাণক উৎসব হিসেবে পালিত হয়। আবার একই দিনে শুভ রাত্রিতে ভগবান মহাবীরের প্রধান শিষ্য গণধর গৌতম স্বামী কেবলজ্ঞানরূপ আলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন; সেই কারণেও দিনটি আলোর উৎসব হিসেবে চিহ্নিত।

খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে রচিত 'হরিবংশ পুরাণে' আচার্য জিনসেন বলেছেন যে, মহাবীরের নির্বাণ কল্যাণক উপলক্ষে সমগ্র বিশ্বের সকল জীব প্রতি বছর এই ভারতক্ষেত্রে গভীর শ্রদ্ধার সাথে দীপাবলী পালন করে। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, ভগবান মহাবীর পাবাপুরীর সুরম্য উদ্যানে উপবিষ্ট ছিলেন। চতুর্থ কালের যখন আর মাত্র সাড়ে তিন বছর সাড়ে আট মাস বাকি, তখন স্বাতী নক্ষত্রযোগে কার্তিক অমাবস্যার দিন ভোরবেলা শুক্লধ্যানের মাধ্যমে তিনি সমস্ত কর্ম বিনষ্ট করেন এবং নির্বাণ লাভ করেন। তাঁর নির্বাণলাভের সঙ্গে সঙ্গেই চার নিকায়ের দেবতারা এসে ভক্তিভরে বিধিসম্মতভাবে ভগবানের দেহের পূজা করেন। অসীম সংখ্যক সুর ও অসুর দ্বারা প্রজ্জ্বলিত বিশাল, দীপ্তিময় প্রদীপের সারি দিয়ে পবিত্র পাবা নগরীর

আকাশ চারদিক থেকে আলোকিত হয়। মহারাজ শ্রেণিক এবং অন্যান্য রাজারাও প্রজাদের সাথে একত্রে ভগবানের নির্বাণ কল্যানকের পূজা করেন। তারপর দেব, মানুষ, তির্যঞ্চ, সকলেই রত্নত্রয়ের প্রার্থনা করতে করতে নিজ নিজ স্থানে চলে যান। সে দিন থেকে বিশ্ববাসী ভগবানের নির্বাণ কল্যাণকের স্মরণে ভক্তিসহকারে প্রতি বছর এই ভারতক্ষেত্রে দীপমালিকা দ্বারা ভগবান মহাবীরকে শ্রদ্ধাভরে পূজা করতে শুরু করে, অর্থাৎ ভগবানের নির্বাণ স্মরণে দীপাবলী উৎসব উদযাপন করে।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত দিগম্বর আগম 'কষায়পাহুড়ে'র 'জয়ধবলা' টীকা আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে গ্রথিত হয়। সেখানে উল্লেখ পাই,

"কত্তিয়মাস কিণ্হ পক্খ চৌদস দিবস কেবলণাণেণ সহ এত্থ গমিয় পরিণিব্বুও বড্ডমানো। অমাবসীএ পরিনিব্বাণ পূজা সয়ল দেবিহিং কয়া" ।

অর্থাৎ কার্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে ভগবান বর্ধমান নির্বাণ লাভ করেন এবং অমাবস্যায় সমস্ত দেবতারা নির্বাণ পূজা করেন।

খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ আচার্য শীলাঙ্ক তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'চউপ্পনমহাপরিসচরিয়' গ্রন্থে লিখেছেন, **"এবং সুরগণপহাসমুজ্জং তম্মি দিণে সয়লং মহিমণ্ডলং দট্ঠুণ তহ চেয় কীরমাণে জণবএণ 'দীবোসবো' ত্তি পসিদ্ধিং গও"**। প্রাকৃত এই গাথার সরলার্থ হল, মহাবীরের নির্বাণের এই দিন 'দীপোৎসব' নামে প্রসিদ্ধ হয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দীপাবলীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে। ভারতে কালগণনার জন্য বিভিন্ন রকম সম্বৎ প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে খ্রিস্টাব্দ, বঙ্গাব্দ, শকাব্দ, ইত্যাদি প্রধান। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সম্বৎ হল 'বীর নির্বাণ সম্বৎ'। এখানে 'বীর' শব্দ ভগবান মহাবীরের পরিচায়ক। 527 খ্রিস্টপূর্বাব্দে কার্তিক কৃষ্ণা চতুর্দশীর অন্তে ও অমাবস্যার প্রারম্ভে স্বাতী নক্ষত্রযোগে তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর নির্বাণ লাভ করেন। তার পরদিন অর্থাৎ কার্তিক শুক্লা প্রতিপদ থেকে 'বীর নির্বাণ সম্বৎ' চালু হয়। অর্থাৎ দীপাবলীর পরদিন

উপমহাদেশের প্রাচীনতম সম্বৎ বীর নির্বাণ সম্বতের 'নববর্ষ'। শুধু শাস্ত্রীয় প্রমাণ নয়, এর সপক্ষে 'পাথুরে' প্রমাণও রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের দ্বারাও এই তথ্য প্রমাণিত। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে রাজস্থানের আজমের জেলার ওডলি নামক স্থানে এক শিলালেখ আবিষ্কার করেন। সেই শিলালেখে বীর নির্বাণ সম্বতের উল্লেখ রয়েছে। ভগবান মহাবীরের নির্বাণলাভের ৮৪ বছর পর এই লেখ লিখিত হয়েছিল; এখানে ৮৪ বীর নির্বাণ সম্বত লেখা রয়েছে। সম্রাট অশোকের পূর্বে শিলালেখে সাল তারিখ উল্লেখ করার প্রচলন ছিল না। সেই হিসেবে ওডলি শিলালেখ এক ব্যতক্রমী দৃষ্টান্ত বলে ঐতিহাসিক ডঃ রাজবলী পাণ্ডে মত প্রকাশ করেছেন। আজমেরের 'রাজপুতানা সংগ্রহশালায়' এই লেখ আজও সুরক্ষিত রয়েছে।

এই মহান উৎসব দীপাবলীকে আজ আমরা যেভাবে পালন করি সেখানে দিনটির তাৎপর্য নেহাৎই ম্লান হয়ে যায়। ঐ দিন ধনলাভের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীপূজা, দাঁড়িপাল্লার পূজা, বাজি-পটকা ফাটানো, নতুন জামাকপড় পরা, ধনতেরাসে কিছু না কিছু কেনা, ইত্যাদি যা কিছু আমরা করি, তা কোনোভাবে জৈন সিদ্ধান্ত অনুসারী নয়। পরস্পরের সাথে দেখা হলে আমরা শুভেচ্ছা বিনিময় করি। কিন্তু কীসের শুভেচ্ছা, সেটা আমরা নিজেরাও জানি না। তবে এর পিছনে কিছু কারণ রয়েছে, যেগুলির প্রভাবে আমাদের দীপাবলী-পালন এরূপ বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রথমতঃ জৈন সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ ব্যবসায়ী। এঁদের জৈনেতর ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যেতে হয়। ফলে 'হিন্দু' মারোয়াড়ি, গুজরাটি প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের কাছে যেটা স্বাভাবিক, তাঁরা যেভাবে এই উৎসব পালন করেন, তার প্রভাবে জৈন বণিকসমাজেও এই সব প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। দ্বিতীয়তঃ জৈন ধর্মাবলম্বীরা প্রকৃত অর্থেই সংখ্যালঘু; জনসংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র যা হয়, এখানেও তা'ই ঘটেছে। সংখ্যাগুরুদের ব্যাপক প্রভাব জৈনদের উৎসব পার্বণে পড়েছে। তৃতীয়তঃ দীর্ঘদিন ধরে জৈন সম্প্রদায় তাঁদের পৃথক সাংবিধানিক পরিচিতি তৈরি করতে পারে নি অথবা চায় নি। বৃহত্তর অর্থে ভারতে উদ্ভূত সকল সম্প্রদায়ই 'হিন্দু'। কিন্তু রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে বৌদ্ধ, শিখ,

প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যে আলাদা পরিচিতি বহুদিন আগেই তৈরি হয়েছে, জৈনদের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় নি। এমনকি সুপ্রিম কোর্টও দীর্ঘদিন যাবৎ জৈনদের পৃথক সত্ত্বার দাবিকে মান্যতা দেয় নি। ফলে জৈনরা বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মত হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত একটি শাখারূপেই পরিচিত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের 'হিন্দু' আচার পালনে কোনও বাধা ছিল না। সব মিলিয়ে পারিপার্শ্বিক প্রভাবে আমাদের বহু উৎসব আমরা এমনভাবে পালন করি, যা জৈন সিদ্ধান্ত সম্মত নয়।

কিন্তু আজ যখন জৈনধর্ম বৈদিক-পৌরাণিক সংস্কৃতি থেকে পৃথক একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পেরেছে, তখন আমাদের উৎসব আমাদের মান্যতা অনুসারেই পালন করা উচিত হবে। সেই অনুযায়ীই আমাদের দীপাবলী পালন করা উচিত।

ভগবান মহাবীরের নির্বাণকল্যাণকের সেই সময়টার কথা ভাবলে দীপাবলীর স্বরূপ বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। গতকাল পর্যন্ত মহাবীর স্বামী আমাদের মধ্যে ছিলেন, আমাদের তাঁর দিব্য প্রবচন শোনার দুর্লভ সুযোগ ছিল; আজ উনি চলে গেলেন, আমাদেরও ছুটি হয়ে গেল – এই কারণে বাজি পটকা ফাটিয়ে আনান্দ করব! অনেকে বলবেন, জীবের যা পরম লক্ষ্য, সেই অমূল্য নিধি 'মোক্ষ' আজকের দিনেই ভগবান অর্জন করেন; তাঁর সেই দুর্লভ সম্পদ অর্জনের আনন্দেই আমরা আনন্দ করি। কিন্তু এই যুক্তি সঠিক বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয় সংস্কৃতি আত্মার বিনাশ বা মৃত্যু স্বীকার করে না। মৃত্যু হল এক পর্যায় থেকে আর এক পর্যায়ে গমন মাত্র। গীতাতে এর স্পষ্ট সমর্থন মেলে –

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী।।

অর্থাৎ, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর গ্রহণ করে।

এবার চিন্তা করা যাক, আমার পিতা অত্যন্ত পুণ্যাত্মা; সারা জীবন শুধু পুণ্য কর্মই করে গেছেন। কর্মফল অনুযায়ী মৃত্যুর পর তাঁর দেবগতি অথবা স্বর্গলোক প্রাপ্তি নিশ্চিত। এমন সময় হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। এবার ব্যবহার নয়ের দৃষ্টি থেকে বলুন, আমার কী করা উচিত? পিতা দেবলোক গমন করছেন, এই আনন্দে নৃত্য করব, নাকি, এতদিন যে বিরাট বটবৃক্ষের ছায়ায় আমরা নিরাপদে নিশ্চিন্তে বাস করতাম, সেই মহীরুহের পতনে বিষণ্ণ হব? অথবা, আমার কন্যার একটি মনোমত পাত্রের সাথে বিয়ে হল, বিয়ের পর বিদায়ের সময় আমি এই ভেবে ডি জে বাজিয়ে নাচ করব যে, যাক, আমার মেয়ে ভালো ঘর-বর পেল; নাকি আমার চোখ অশ্রুতে ভিজে আসবে? মেয়েকে আর দেখতে পাবো না, এরপর থেকে কালেভদ্রে কদাচিৎ সে আমার ঘরে আসতে পারবে, এটা ভেবে মন বিষণ্ণ হবে না কি? বাতাবরণে একটা বিষণ্ণতার সুর বাজতে থাকবে না কি? তেমনই, কাল পর্যন্ত যাঁকে চোখের সামনে দেখতাম, আজ তিনি আর নেই। তিনি অষ্টকর্মের উপর বিজয় প্রাপ্ত হয়ে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য, অনন্ত ঐশ্বর্য এবং অব্যাবাধ সুখ লাভ করেছেন; এজন্য তাঁর অনুগামীদের খুশি হওয়া তো উচিত; কিন্তু সেই খুশিতে নিশ্চয়ই তারা আনন্দ উল্লাস করে নি, ওজনদাঁড়ির পুজো করে নি, আমোদপ্রমোদে মেতে ওঠে নি, ধনাকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্মীপুজো করে নি। সেইক্ষণে তাদের মুক্তিপথের দিশারীর বিয়োগজনিত বেদনাই তাঁর অনুসারীদের হৃদয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই অনুভূতিটাই দীপাবলী উৎসবের মধ্যে প্রকাশিত হওয়া দরকার।

তো, আমরা কীভাবে এই উৎসব পালন করব? বাজি পটকা ফাটালে যে শুধু বায়ুকায় জীবের প্রতিই হিংসা হয়, তা'ই নয়, বহু সূক্ষ্ম জীবের প্রতিও হিংসা হয়। পরিবেশও দূষিত হয়। অসুস্থ ব্যক্তিদের বাজির আওয়াজে কষ্ট হয়। রাস্তার কুকুর ও অন্যান্য প্রাণীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জৈন ধর্ম পরিবেশবান্ধব ধর্ম। স্বাভাবিক ভাবেই এই ভাবে উৎসব পালন করা আমাদের 'জিও আউর জীনে দো" সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী। দীপাবলীতে আতশবাজি ব্যবহারের উল্লেখ কোনো প্রাচীন গ্রন্থে নেই।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা" আপ্তবাক্যের আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন। ভগবান মহাবীরের প্রধান শিষ্য গণধর গৌতমস্বামী যেভাবে দীপাবলী উদযাপন করেছিলেন, সেটাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত, কেননা মহাবীর স্বামীর পর উনিই আমাদের মার্গদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। গৌতমস্বামী প্রতিদিন ভগবান মহাবীরের দিব্যধ্বনি তিনবারে মোট ৭ ঘন্টা ১২ মিনিট করে শুনতেন। দীর্ঘ তিরিশ বছরে এমন একটি দিনও যায় নি যে, তিনি ভগবানের দিব্যধ্বনি ক্ষরণের সময় অনুপস্থিত ছিলেন। অন্তর্মুহূর্তের মধ্যে দ্বাদশাঙ্গ রচনা করার মত বিরল প্রতিভার অধিকারী স্বয়ং গৌতমস্বামী যেখানে একদিনও জিনবাণী শ্রবণে অবহেলা করেন নি, সেখানে আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে তো জিনবাণী স্বাধ্যায়ের গুরুত্ব অনেক বেশি।

না, ভগবানের স্থূলদেহ পরিত্যাগের পর গৌতমস্বামী হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেন নি। তিনি বিলাপ করেন নি। তিনি বহির্জগত থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে এনে অন্তর্জগতে লীন হলেন। এমনভাবে লীন হলেন যে, আর সেই অবস্থা থেকে বেরোলেন না। এভাবেই আত্মদর্শনের মাধ্যমে তিনি ভগবানের মতোই কেবলজ্ঞান লাভ করলেন এবং বীতরাগ তত্ত্বজ্ঞানের প্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠলেন। পরে বারো বছর পর তাঁর নির্বাণের দিন সুধর্মাস্বামীর কেবলজ্ঞান হয়। এভাবেই বীতরাগ বিজ্ঞানের গঙ্গাধারা নিরন্তর প্রবাহিত থাকে।

এখন ভগবান মহাবীর আমাদের মধ্যে নেই; সুধর্মাস্বামী, জম্বুস্বামীর মত সর্বজ্ঞ আচার্যও নেই। ফলে দিব্যধ্বনি শ্রবণের সুযোগও নেই। পঞ্চম কালের এটাই দুষ্প্রভাব। কিন্তু বহু জ্ঞানী সাধুসাধ্বী ও আচার্য এখনও আছেন। তাঁদের পদতলে বসে জিনবাণী শ্রবণের মাধ্যমেই দীপাবলীর দিন আমাদের পবিত্রভাবে অতিবাহিত করা উচিত। এই দিনে আমাদের নিকটবর্তী যে কোনো স্থানে জিনবাণী বাচনার ব্যবস্থা করা দরকার। সেটা সম্ভব না হলে কোনো মুনি মহারাজের পদতলে বসে তাঁর মুখ থেকে শোনা দরকার। সেটাও সম্ভব না হলে নিজেই জিনবাণী পঠন, মনন ও চিন্তনের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখা উচিত। বীতরাগী প্রভুর

নির্বাণের দিন পরিগ্রহের কামনা প্রভুর অবমাননারই সামিল। নতুন বস্ত্র পরিধানে কোনও সমস্যা নেই। বীর নির্বাণের পর পাবাপুরীর সমস্ত নগরবাসী দীপ সাজিয়ে সমগ্র নগরকে অমাবস্যার অন্ধকারের মধ্যেও আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। অগণিত দেব-বিমানের দ্যুতিতে চরাচর হয়ে উঠেছিল দিব্য আলোকময়। তাই দীপমালা তো আমরা রচনা করবই। কিন্তু পরিগ্রহ বৃদ্ধিকারী ও হিংসক বিভিন্ন কাজকে এর সাথে জুড়ে দিলে তা হবে চরম মূর্খতা।

মনে রাখা দরকার, আমাদের উৎসবের প্রায় সব কর্মকাণ্ডই প্রতীকী। এর পেছনে লুকিয়ে থাকে তাদের আধ্যাত্মিক অর্থ। সেই প্রতীকগুলির আধ্যাত্মিক অর্থগ্রহণ ব্যতিরেকে উৎসব পালন নিরর্থক আড়ম্বরে পরিণত হয় এবং পাপকর্ম বন্ধের কারণ হয়। অন্ধকার অজ্ঞানতার প্রতীক এবং দীপ তথা আলোক জ্ঞানের প্রতীক। দীপাবলীর আলোকমালায় যেমন অমানিশার ঘোর অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেভাবেই নিজের মধ্যে জ্ঞানের অনুশীলন ও পরিশীলনের দ্বারা আত্মোপলব্ধির উৎসব হল দীপাবলী। দীপাবলী উৎসবের প্রধান তাৎপর্য হল জ্ঞানরূপ আলোর দ্বারা আমাদের আত্মা থেকে ক্রোধ, অহংকার ও লোভের অন্ধকার দূর করে আত্মশুদ্ধি ঘটানো, যাতে আমরা আত্মোপলব্ধির শাশ্বত আনন্দে নিমজ্জিত হয়ে মুক্তির প্রাসাদ লাভ করতে পারি। দীপাবলীর মাধ্যমে ভারতাত্মার সেই শাশ্বত বাণীরই প্রকাশ ঘটুক,

অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতংগময়।।

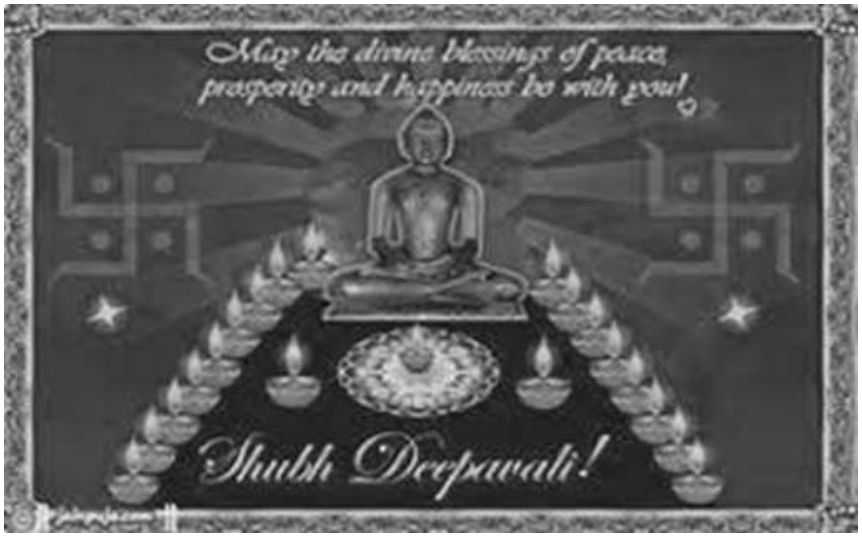

জৈন ধর্ম - ভারতীয় দর্শনে অহিংসার সন্ধানে

- রাজীব মজুমদার

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ‘ধর্ম’ শব্দটা উচ্চারন করলে, যে কোন যুক্তিবাদী ব্যক্তির চোখে, তাত্ত্বিক পণ্ডিতের চোখে কিংবা সাধারন লোকের চোখেও যে চিত্রটা ভেসে ওঠে, তা হচ্ছে প্রতিটি ধর্মেই ধর্মগ্রন্থ, ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা, ধর্মীয় আচার বা রিচ্যুয়াল এবং প্রার্থনাগৃহের সন্ধান পাওয়া যাবে। জৈন ধর্মকে ওপর থেকে দেখলে, অন্য পাঁচটি ধর্ম থেকে আলাদা করা মুশকিল; বিশেষতঃ যেহেতু জৈনরা খাদ্য, উপবাস এবং আচার আচরনের ওপর অনেক কঠিন বিধি নিষেধ আরোপ করে। কিন্ত জৈন গ্রন্থে ও ইতিহাসে ঢুকলে যে জৈন দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়, তাতে এমন এক ধর্মের ঠিকানা আছে, যার উৎপত্তি, মূল দর্শন এবং লক্ষ্য অন্যান্য ধর্ম থেকে বিশেষ ভাবে আলাদা, আদি এবং অকৃত্রিম।

বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী শ্রমণ সংস্কৃতি থেকে প্রাচীন ভারতে যে ক’টি ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে, তার মধ্যে জৈন ধর্মেই এথেইজিমের (নাস্তিকতা শব্দটা এখানে ব্যাবহার করা যাবে না কারন এথেইজম শব্দটি নাস্তিকতার সুপারসেট বা অনেক ব্যাপৃত অর্থে ব্যাবহৃত) চূড়ান্ত বিকাশ বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত। জৈন ধর্মই আমার জানা একমাত্র ধর্ম, যা এথেইজিম বা নাস্তিকতার প্রথম প্রতিপাদ্য মেনে চলে। এই প্রথম প্রতিপাদ্য হচ্ছে পরম সত্যের (অ্যাবসল্যুটিজম্) অস্তিত্ব নেই এবং সেই জন্যেই বহুত্ববাদই (জৈন পরিভাষায় ‘অনেকান্তবাদ’) একমাত্র গ্রহণীয়। জৈন দর্শনের শুরুই হচ্ছে সেই পরম সত্যের অনস্তিত্ব থেকে এবং বলা হচ্ছে বাস্তববে সব সত্যই আপেক্ষিক এবং একই বাস্তবতাকে নানান আপাত সত্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। বস্তুতঃ পোষ্ট মর্ডানিজমের এই মূল সূত্রগুলি জৈন ধর্মে তথা ভারতবর্ষে বহুকাল থেকেই ছিল। পাশ্চাত্য দর্শন বিংশ শতাব্দীতে যে উপলব্ধি এবং সিদ্ধান্তে এসেছে, আদিম ভারতের নাস্তিক্য দর্শনে তার প্রায় সবটাই পাওয়া যাবে। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে ঈশ্বরভিত্তিক ধর্মের আধিক্যে ভারতীয় নাস্তিক্য দর্শনের অনেকটাই বিলুপ্ত; তবুও যেটুকু টিঁকে আছে, তার অধিকাংশই পাওয়া যাবে জৈন ধর্মের

মধ্যে।

পৃথিবীতে জৈন ধর্ম বাদ দিয়ে সব ধর্মই ঈশ্বর, আল্লা, কৃষ্ণ বা কোন না কোন 'পরম সত্য'র (যেমন বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে ঈশ্বর না থাকলেও দুঃখ এবং দুর্দশার চার পরম সত্য আছে) ওপর দাঁড়িয়ে যা সেই ধর্মগুলির সেন্ট্রাল ক্যানন বা কেন্দ্রীয় বিধির কাজ করে। এর কারণ হচ্ছে, সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে, সব ধর্মেরই জন্ম হয়েছে কোন না কোন ঐতিহাসিক সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজনে, যার সেলফ অর্গানাইজেশন বা বিপ্লবের সংগঠনের জন্যে এই ধরনের পরম সত্যর ধারণা লোকেদের মনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করাতে হত। এই স্থানেই জৈনধর্ম আলাদা। কোন ধর্ম ঠিকঠাক বুঝতে গেলে, সব থেকে গুরুত্বপূর্ন হচ্ছে সেই ধর্মের উৎপত্তিকে বোঝা; সমসাময়িক ইতিহাসকে বোঝা। এটা বুঝলে বোঝা যাবে জৈনধর্ম কেন আলাদা।

কেন আলাদা, সেটা ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে বোঝা সম্ভব। আমাদের ইতিহাসে পড়ানো হত, এখনো পড়ানো হয়, জৈন ধর্ম ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিবাদে সংঘটিত সামাজিক বিপ্লব যা মহাবীর দ্বারা স্থাপিত। আমিও জৈনধর্ম নিয়ে ওপর ওপর জেনে এটাই মনে করতাম। কিন্তু এটা সম্পূর্ন ভুল ধারণা। জৈন ধর্মের ইতিহাস সব থেকে বেশি চিত্তাকর্ষক, এখনও বহুলাংশে অজ্ঞাত এবং অন্য ধর্মের ইতিহাস থেকে সম্পূর্ন আলাদা। জৈনধর্মে ২৪ জন তীর্থঙ্কর বা গুরুর সন্ধান আছে বটে, কিন্ত বুদ্ধ বা মহম্মদের ন্যায় এরা কেউই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নন। এঁরা ছিলেন ধর্মের সংকলক এবং আদর্শের অনুসারী, যাঁদের আচরন দেখে জৈনরা নিজেদের দর্শন ঠিক করে। ২৩ তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ প্রথম ঐতিহাসিক জৈন ধর্মগুরু, যার সময়কাল অষ্টম খ্রিস্টপূর্বাব্দ। কিন্ত হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর খনন কার্য থেকে যে আদি ভারতীয় ধর্মের রূপটি উঠে আসে, তা ছিল সম্পূর্ণ অষ্টাঙ্গিক যোগ নির্ভর। ঐতিহাসিক হেনরি মিলার এবং জন মার্শাল মহেঞ্জোদারোর যোগী মূর্তিগুলির ওপর গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এগুলি জৈন ধর্মের কায়োৎসর্গ মুদ্রার প্রাথমিক রূপ। একাধিক ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একই সিদ্ধান্তে

এসেছেন। বহু বিদ্বানের মতে, মহেঞ্জোদারো সভ্যতার ধর্ম ছিল জৈন ধর্মের আদিরূপ। এবং হরপ্পা মহেঞ্জাদারোর ধর্মই আজ

অব্দি টিঁকে গেছে জৈন ধর্মের মধ্যে দিয়ে।

জৈনরা বিশ্বাস করে যে, তাদের ধর্ম সম্পূর্ণ "ন্যাচারিলিস্টিক ধর্ম" যা মানব বিবর্তনের পথে প্রথম ধর্ম বা মানুষের আদি ধর্ম। ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই ধারণার যথেষ্ট ভিত্তি আছে। জৈন ধর্মের মূল নীতিগুলি কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে জড়িত নয়, যা অন্য সব ধর্মের জন্যেই সত্য। যেমন ভাগবত গীতার জন্মের উপলক্ষ মহাভারতের যুদ্ধ, কোরানের জন্ম মহম্মদের ইতিহাসের সাথে সম্পূর্ন ভাবে যুক্ত। জৈন দর্শন কী, সে ব্যাপারে পরে আসছি। তার আগে এটা বোঝা যাক যে, কী ভাবে হোমো ইরেক্টাস থেকে হোমো স্যাপিয়েন্সের আবির্ভাবের সাথে সাথে "সামাজিক রিচ্যুয়াল বা আচার আচরণের জন্ম হয়েছে (রিচ্যুয়াল অবশ্য হোমিনিড দের অন্যান্য স্পিসিসের মধ্যেও ছিল যারা হোমোস্যাপিয়েন্সের সমসাময়িক ভাবে পৃথিবীতে কিছুদিন ছিল)। হোমো স্যাপিয়েন্সদের গত ২০০,০০০ বছরের ইতিহাস বিতর্কিত এবং অস্পষ্ট। তবে যেসব ব্যাপারে একমত হওয়া যেতে পারে, সেগুলি হল -

১) হোমো স্যাপিয়েন্সদের আবির্ভাবের সাথে সাথে সামাজিক তথা গোষ্ঠী-আচরণ সুস্পষ্ট রূপ নেয় প্রায় ৭০,০০০ বছর আগে।

২) হোমো স্যাপিয়েন্সরা পৃথিবীর যেখানেই গেছে, ১০,০০০ বছরের মধ্যে সেই স্থানে বন এবং ৯০% প্রাণীকুল ধ্বংস করেছে; কারণ এরা ছিল সব থেকে কৌশলী শিকারি।

৩) এদের মধ্যে আদিতে আচারের অস্তিত্ব থাকলেও কোন গুহাচিত্রেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ এদের আদি আচরণ, যা ধর্মের মতোই একটা গোষ্ঠী মানতে বাধ্য ছিল, তা একধরনের নাস্তিক ধর্ম হতে বাধ্য। কারন হোমো স্যাপিয়েন্সদের গুহাচিত্রে পশুপাখী ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর জাতীয় অ্যাবস্ট্রাকশনের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং ভারতে তথা গোটা পৃথিবীতেই

ঈশ্বর ভিত্তিক ধর্মের পূর্বসূরী ছিল নাস্তিকতা বা সম্পূর্ন ঈশ্বরবর্জিত একধরনের দর্শন-নির্ভর ধর্ম যা প্রকৃতি, প্রাণী এবং পরিবেশের সার্বিক মঙ্গলকামনা থেকে উদ্ভুত। কারন এমনটা না করলে সেকালে সীমিত খাদ্য এবং প্রাণীকুলের ধ্বংসসাধন মানবসভ্যতার অস্তিত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করত। বিবর্তনের প্রয়োজনে মানব সভ্যতায় জৈন ধর্মের মতন নাস্তিক অথচ অহিংস এবং ত্যাগী (বা ব্রতবদ্ধ - অর্থাৎ মানব ও প্রাণীকুলের স্বার্থ রক্ষায় আমি এই এই কাজ করব না) ধর্মের উৎপত্তি ঈশ্বর ভিত্তিক ধর্মের অনেক আগে আসার কথা। জৈন ধর্মের মধ্যে আমরা সেটাই দেখি।

আমার উপরোক্ত ধারণা আরো বদ্ধমূল হয় এই জন্যে যে, সমগ্র জৈনদর্শনে ঈশ্বর কী, তিনি আছেন কি নেই, এসবের কোন অস্তিত্ব নেই। ফলে নেই কোন স্রষ্টার ধারণাও। যেখানে বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধ বারংবার "ঈশ্বর আছেন কি নেই" - এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাঁর উত্তর ছিল, ঈশ্বর অপ্রাঙ্গিক হাইপোথিসিস। কিন্ত জৈনধর্ম নিয়ে পড়লেই বোঝা যায় এই ধর্মের উৎপত্তি প্রাক-ঈশ্বর যুগে, যখন বিবর্তনের পথে ঈশ্বর মানবসভ্যতায় অজ্ঞাত। মানব সভ্যতার সুরক্ষার জন্য, সভ্য মানুষের প্রতিষ্ঠার জন্যে জৈনাচারের ধাপগুলি অসম্ভব যৌক্তিক। তা বিশ্বাসের ওপর না, বরং দার্শনিক যুক্তি ও সমকালীন জ্ঞানবিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্মের প্রধান উপপাদ্য- মানুষের প্রকৃতি - অর্থাৎ মানুষকে, নিজেকে জানা এবং নিজের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ককে জানা। এবং এই মহাবিশ্বে ও বাস্তবতায় আমাদের অবস্থান থেকে, সবার মঙ্গল কামনায় কিছু আচার আচরনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা।

অনেকেরই ধারণা ঈশ্বর তথা ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস নৈতিকতার মূল উৎস। নাস্তিকতা মানে নৈতিকতা

উচ্ছন্নে যাবে। এই ধারণা ভাঙার সব থেকে ভাল উপায় জৈনধর্ম অধ্যয়ন; এটি সম্পূর্ণ সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর এবং পরম সত্য বর্জিত দর্শন। এই দুইকে বর্জন করেই (কারণ তখনও বিবর্তনের পথে আজকের ঈশ্বর এবং ধর্মগুলি আসে নি) জৈন ধর্মে অত্যন্ত যুক্তিবাদী একটি

নৈতিক দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে যা মানবিকতা, সততা এবং প্রেমে অন্য ধর্মগুলির অনেক ওপরেই থাকবে। এবং যদি ধর্মে অমানবিকতা, অত্যাচারের ইতিহাস দেখা যায়, তাহলে একমাত্র জৈন ধর্মই সেই দাবি করতে পারে যে, তাদের ধর্মের ইতিহাস কখনোই হিংসায় রাঙা হয় নি। কোন রক্তপাত ঘটে নি। নৈতিকতার ঐতিহাসিক, বাস্তব এবং তাত্ত্বিক মানদণ্ডে এই নাস্তিক পরম সত্য বর্জিত ধর্ম তুলনাহীন। অন্য ধর্মের ইতিহাস যেখানে ক্ষমতা এবং ধর্মীয় আধিপত্যবাদের রঙে রাঙা, জৈন ধর্মের ইতিহাস সেখানে ত্যাগের উদাহরণে সমুজ্জ্বল। যারা ঈশ্বর ভিত্তিক ধর্মকে নৈতিকতার উৎস বলে মনে করেন, তাদের ভুল ভাঙার প্রকৃষ্ট উপায় জৈন ধর্ম।

এবার আমি সংক্ষেপে জৈন ধর্মের মূল জীবনদর্শন আমার নিজের উপলব্ধি থেকেই ব্যাখ্যা করব।

জৈন ধর্মের চারটি স্তম্ভ। অর্থাৎ জৈন ধর্মের অনুসারীরা নিম্নোক্ত চারটি মূল জীবন দর্শনকে জৈন আচরনের ভিত্তি বলে জানেন।

অহিংসা:- জৈন ধর্মের মূল নীতি অহিংসা। কাউকে কোন ভাবে দৈহিক বা মানসিক ভাবে আঘাত করা যাবে না। এবং তা পশুপাখী উদ্ভিদ সবার ওপরই। নিজে বাঁচার জন্যে অন্যের মৃত্যু, অন্য প্রাণের মৃত্যু - এই ধর্মে স্বীকৃত না। অন্য কয়েকটি ধর্মের সাথে এখানেই জৈন ধর্মের বিরাট পার্থক্য। অনেকে প্রশ্ন করবেন, তাহলে আত্মরক্ষার জন্যে হিংসা কেন স্বীকৃত না? এর মূল কারণ জৈন ধর্মে মানুষকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করে দেখা হয় না। সে প্রকৃতির অংশ। তার মৃত্যু-জীবনের পরম নিয়তি, প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া এবং সেই পরম নিয়তিকে দু'দিন দূরে পাঠানোর জন্যে হিংসার কোন জাস্টিফিকেশন নেই। বরং অহিংসার জন্যে নিজের প্রাণত্যাগ সমাজের পক্ষে অনেক বেশী মঙ্গলকর।

এই নীতির অবাস্তবতা প্রশ্নবিদ্ধ হতেই পারে। কিন্ত বাস্তবত এটাই যে হিন্দু, খ্রিস্টান বা মুসলমানরা মানব সভ্যতাকে এই ধর্মযুদ্ধ, ক্রুসেড বা জিহাদ নামে এক সম্পূর্ণ অমানবিক এবং অস্থিতিশীল রাজনীতির জন্ম দিয়েছেন। আজকের সভ্যতা অনেকটাই বৃটিশ ইউটিলিটারিয়ান দার্শনিকগণের অবদান কারন আমাদের সভ্য আইনগুলি সেখান থেকেই এসেছে যা ধর্মীয়

আইন থেকে মানুষকে অনেকটাই মুক্ত করেছে। ইউটিলিটারিয়ান আইনগুলির সাথে জৈন ধর্মের অনেক মিল আছে।

সততা:- জৈন ধর্মের দ্বিতীয় স্তম্ভ সততা। জৈন মতে একজন পুত্র যেমন মাকে বিশ্বাস করতে পারে, মানুষের সততা সেই পর্যায়ের হওয়া উচিৎ যাতে তোমাকে সবাই মায়ের মতন বিশ্বাস করবে। আর যদি সততার জন্যে হিংসার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা থাকে, জৈন নীতি অনুযায়ী নির্বাক থাকায় শ্রেয়।

অচৌর্য:- বিনা অনুমতিতে অপরের কোনো দ্রব্য নেওয়া যাবে না, তা সে যত তুচ্ছই হোক না কেন। লোক ঠকানো যাবে না। এ বিষয়ে জৈন ধর্মের মুখ্য নির্দেশ -

১। কারো আর্থিক বা অন্য দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা চুরির সমান।

২। কেউ স্বেচ্ছায় দিলে তবেই তা গ্রহণ করবে। বলপূর্বক বা ছলপূর্বক কিছু নেওয়া নিষিদ্ধ। এখানে অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সাথে বিরাট পার্থক্য। এই সব ধর্মে ধর্মের জন্যে বল বা ছল প্রয়োগ স্বীকৃত।

৩। অন্যায়ভাবে লাভ করা যাবে না।

৪। চুরি করা বস্তু বা যে লাভ অনৈতিক কাজ থেকে আগত, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ভারতে পার্সিদের বাদ দিলে জৈনরাই সব থেকে বড় ব্যবসায়ী। এর মূল কারণ এই নীতিগুলির জন্যে জৈন ব্যাবসায়ীরা সব থেকে বেশী বিশ্বাসযোগ্য। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা, সফল সৎ ব্যবসায়ী হওয়ার প্রথম ধাপ।

ব্রহ্মচর্য:- জৈন ধর্মে স্ত্রী ছাড়া আর কারুর সাথে সহবাস স্বীকৃত নয়। তবে জৈন ধর্মের মূলনীতি এক্ষেত্রে হচ্ছে, যা কিছু নেশার বস্তু, যা কিছু আসক্তির জন্ম দেয়, তার সব কিছুই পরিত্যাগ করতে হবে। আসক্তি থেকে মুক্তি, তা মদ্যপান থেকে ভাল খাবার অনেক কিছুই হতে পারে – তা'ই কাম্য। ফলে এই ধর্মে মদ্যপান, মাদকাসক্তি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অপরিগ্রহ:-বিষয় সম্পত্তি, অর্থ, গৃহ, গাড়ি-বাড়ি, পোশাক-আশাক, ইত্যাদির ওপর আমিত্ব কমাতে হবে। আমার সম্পত্তি, আমার বাড়ি, আমার লেখা, আমার কৃতিত্ব, ইত্যাদি বিজাতীয় বন্ধন এবং আসক্তি ভ্রম। এই ধরনের ভ্রম মানুষের অহঙ্কার বাড়ায় এবং তাকে বিপথে পরিচালিত করে। আজ যে সম্পত্তি আছে, কাল না'ও থাকতে পারে। সুতরাং এই সব কিছুর ওপর থেকে নিজের স্বামীত্ব বা অধিকারীত্বসুলভ মনোভাব থেকে মুক্তি পেতে হবে। সম্পত্তি থাকা অন্যায় নয় - কিন্ত সম্পত্তির ওপর আসক্তি একধরনের পরিত্যাজ্য।

এবার আসব জৈন ধর্মে পুনর্জন্ম এবং আত্মার অস্তিত্ব প্রসঙ্গে। এগুলি জৈন ধর্মের ভিত্তি, কারণ আদর্শ জৈন আচরণের মূল লক্ষ্য মোক্ষ; যাতে আর আবার জন্মাতে না হয়। এবং যেহেতু যুক্তিবাদী সমাজে এগুলি গ্রহণযোগ্য জ্ঞান নয়, সেহেতু ঐতিহাসিক ও সামাজিক দৃষ্টিতে আমরা জানব বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মে এই পুনর্জন্ম এবং আত্মা নামক দার্শনিক বস্তুটির উৎপত্তিস্থল কী?

হোমো স্যাপিয়েন্সদের আদিম গুহাচিত্র ও ফসিল থেকে এটা পরিষ্কার, যে মৃত্যুর ক্ষেত্রে বা মৃতকে সমাধিস্থ করার ক্ষেত্রে আচার আচরণের মূলভিত্তি এই মানব বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর জীবন আছে। মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস মানব সভ্যতায় ঈশ্বরের জন্মের আগে এসেছে। স্বর্গের সাথে যেহেতু ঈশ্বরের ধারণা সংপৃক্ত, তাই এটা অনুমান করা শক্ত নয়, যে ঈশ্বরের ধারণার জন্মের আগে, হোমো স্যাপিয়েন্সরা যেসব রিচুয়াল পালন করত, তার উদ্দেশ্য ছিল পরের জন্ম বা পুনর্জন্ম; স্বর্গলাভ নয়। কারণ ঈশ্বরের ধারণা যেহেতু তাদের মধ্যে ছিল না, তাই স্বর্গের ধারণাও থাকতে পারে না। সুতরাং প্রাক-ঈশ্বর পর্বে ধর্ম ও রিচ্যুয়ালের ভিত্তিই ছিল পুনর্জন্মে বিশ্বাস। জৈন ধর্মের মতো প্রাক ঐশ্বরিক ধর্ম তাই পুনর্জন্মের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এবং বৌদ্ধ ধর্ম মূলতঃ জৈন ধর্ম থেকেই এই ধারণাটি গ্রহণ করে।

কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে হোমো স্যাপিয়েন্স দের আচরনে কেনই বা মৃত্যুর পর বাঁচার বিশ্বাসের জন্ম নিল? মনে রাখতে হবে বিবর্তনের পথে, মানব সভ্যতায় সব বিশ্বাসের আগমন হয়েছে

মানুষের বেঁচে থাকার সারভাইভাল স্ট্রাটেজিকে উন্নত করতে। জীবনের উদ্দেশ্য যেহেতু বিজ্ঞান বা যুক্তিবাদ দিয়ে বার করা সম্ভব নয় এবং যেহেতু এটি একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন, সেহেতু এটা অনুমান করা যায় যে, শুধু একজন্মে বিশ্বাস মানুষের মনে হতাশার এবং উদ্দেশ্যহীনতার জন্ম দিতে পারে। যা থেকে মানুষ উদ্দেশ্যহীনতায় ভুগে ভোগবাদী আসক্তিতে ডুবে যেতে পারত, যা তৎকালীন সমাজের সারভাইভালের জন্যে কাম্য ছিল না। যা আধুনিক সমাজের স্থিতিশীলতার জন্যেও কাম্য না। সুতরাং জৈন ধর্ম থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, এই ধরনের বিশ্বাস হোমোস্যাপিয়েন্সদের মধ্যে আরো স্থিতিশীল সমাজের জন্ম দিচ্ছিল। তাই এই পুনর্জন্মে বিশ্বাসটিকে কেন্দ্র করেই প্রথম সামাজিক নৈতিকতা এবং ধর্মীয় আচার আচরণের জন্ম হয়।

সেকালে যেখানে ধর্মের উদ্দেশ্যই ছিল মানব সমাজে শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা, এটা বোঝা শক্ত নয়, ঈশ্বরপূর্ব যুগে, যখন ঈশ্বরের রক্তচক্ষু এবং পাপের জন্ম হয় নি, পুনর্জন্মের আশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করা ছিল একমাত্র পথ। সেটাই জৈন ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম করে থাকে।

এবার আত্মার প্রশ্নে আশা যাক। পুনর্জন্ম মানেই একটা আত্মার ধারণাকে স্বীকার করে নিতে হয়, যা বার বার জন্মাচ্ছে। এটাও আসছে সেই আগের কারণটা থেকেই। এগুলি অবিচ্ছেদ্য ধারণা।

জৈন ধর্ম নিয়ে, আরো বেশী কিছু লিখতে পারলে, ভাল লাগত। কিন্ত যেটুকু নিজের দৃষ্টিতে বুঝেছি, সেটুকুই লিখলাম। এই জন্যেই লিখলাম, যে জৈন ধর্মকে বোঝার মাধ্যমে প্রাক-ঐশ্বরিক ধর্মকে বোঝা সম্ভব; ধর্মের বিবর্তন বোঝা সম্ভব। ঈশ্বরের জন্মের আগেও যে ধর্মের অস্তিত্ব ছিল সেটা বোঝা যায়। এবং সেই নাস্তিক ধর্মদর্শন যে ঈশ্বরভিত্তিক ধর্মের থেকে উন্নত ছিল, সেটাও আমরা দেখছি। জৈন ধর্ম মানব সভ্যতার সম্ভবত আদিমতম এবং আধুনিকতম ধর্ম, যার দর্শন সম্পূর্ন ভাবেই ঈশ্বরবর্জিত, শাশ্বত ও চির আধুনিক।

পার্শ্বনাথমূর্তিকথা

- সঞ্জীব চক্রবর্তী

গত ১৬ই অক্টোবর ২০২৩ তারিখে পুরুলিয়ার এক প্রত্যন্ত অংশে অবস্থিত অখ্যাত গোলামারা গ্রাম সহসা সংবাদপত্র এবং সামাজিক মাধ্যমের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে। স্থানীয় এক জোড় থেকে অতি যত্নে তুলে আনা হয়েছে প্রমাণমাপের এক জিন মূর্তি। আন্তর্জাতিক বাজারে তার অবিশ্বাস্য মূল্য লোকমুখে শুনে অনেকে ভিড় করলেন। ভক্তেরা চন্দন সিন্দুর লেপন করে ভক্তির অর্ঘ্য দিলেন। সব মিলিয়ে পুরুলিয়া জেলায় একদা জৈন-প্রভাব সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেল।

ছোটনাগপুরের মালভূমির পূর্ব ঢালে বীরভূম বাঁকুড়া পুরুলিয়ার গ্রামের প্রান্তরে নদীর ধারে আজও বহু জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি খোলা মাঠের নীচে গাছের তলে পড়ে আছে। কোথাও আবার নদীর বুকে, বা মাটির ঢিবির তলে, অনেককিছু আবিষ্কারের আজও অপেক্ষারত। পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার বহু গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে থাকা জীর্ণ, আগাছায় ভরা পরিত্যক্ত মন্দিরের অনেকগুলিই জৈনমন্দির।

এই সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে অনুমান করা কঠিন নয়, যে একসময় বাংলার রাঢ় অঞ্চলে জৈনধর্মের অনুগামীদের এক বিশেষ সমাবেশ ছিল। জিনধর্মের অনুগামীরা যেমন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচর্চায় উৎসাহী, তেমনি শিলামূর্তি ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠার মতো আর্থিকভাবে সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন। সেই সমৃদ্ধির কাল হঠাৎ করেই অবসান হলেও মাঠেপ্রান্তরে সেকালের রেশ আবিষ্কৃত বা অনাবিষ্কৃতভাবে ছড়িয়ে আছে।

সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠবে কারা ছিলেন সেই জৈন-অনুগামীরা, যাঁরা প্রায় সহসা বিলুপ্ত হলেন সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের মতো? এক প্রাচীন জৈনগ্রন্থ আচারঙ্গসূত্রে উল্লেখ আছে যে তপস্যার কালে বর্ধমানস্বামী মহাবীর 'দুচ্চর লাঢ়দেশে' দ্বাদশবর্ষ ধরে পরিভ্রমণ করেছিলেন।

লাঢ় বা রাঢ় অঞ্চল তখন বজ্রভূমি ও সুব্ভভূমিতে বিভক্ত ছিল। বজ্রভূমি হল স্পষ্টতই পার্বত্য মালভূমি অঞ্চল। সুব্ভভূমি বা সুহ্মদেশ ছিল জলাজঙ্গলে ভরা নদীর নিম্ন অববাহিকা। লাঢ়দেশের আদি অধিবাসীরা বর্ধমানস্বামীর মললিপ্ত বিচরণশীল আকার দেখে অদ্ভুত মনে করে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলেন বলে কথিত আছে।

কারা ছিলেন এই অধিবাসীরা? মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের সূত্রে অসুররাজ বলি এবং তাঁর পঞ্চপুত্রের কাহিনী অঙ্গ বা বিহারের অংশ, বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গ, কলিঙ্গ বা উড়িষ্যার অংশ, পুণ্ড্রদেশ বা উত্তরবঙ্গ এবং সুহ্ম বা পশ্চিমবঙ্গকে একসূত্রে বেঁধে দিল। ভাগবতপুরাণকার বলিরাজের ষষ্ঠপুত্র অন্ধ্র অন্ধ্রপ্রদেশবাসীকেও লাঢ়দেশের বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেললেন।

পুরাণের সূত্রেই জানা যাচ্ছে যে তাঁরা সকলেই ছিলেন কান্তার, নদীতীর, অরণ্য ও গ্রামবাসী। চন্দ্রকেতুগড়, মঙ্গলকোট, পাণ্ডুরাজার ঢিবির মতো অঞ্চলে নাগরিক সভ্যতারও বিকাশ হয়েছিল। পুরনো অধিবাসীদের ধর্মচর্চার প্রাচীনধারা নানান যক্ষ, শিব, ধর্মঠাকুর, মনসা, চণ্ডী, কালী, দিদিঠাকরুণ, শীতলা, সিনি, গরাম, বড়াম, বৃক্ষলতা শিলাপূজা, ব্রতপালন, আলপনা, উলুর মধ্যে আজও বেঁচে আছে। লোকায়ত ধর্মচর্চারধারার উদ্ভবকাল নিহিত আছে স্মরণাতীত অতীতের গর্ভে।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, খরা, বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, সাপ ও হিংস্র বন্য জন্তুর আক্রমণ, মহামারী, রোগপীড়া, শিশুর মঙ্গলামঙ্গল, শতবর্ষ আয়ুলাভ - এই সমস্ত পার্থিব কামনা লোকায়ত সমাজের মতো বৈদিক সমাজেরও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি ছিল। তবে বৈদিক ঋষিরা চোখে-দেখা জগতের আবরণ অতিক্রম করে গভীরতর জীবনজিজ্ঞাসা ও পরম সত্যের খোঁজ করলেন বেদান্ত বা উপনিষদের যুগে। যজ্ঞগৃহে যজ্ঞের অগ্নিতে হব্যপ্রদানের পাশাপাশি অন্তরে প্রজ্বলিত জ্ঞানের অগ্নিতে জিজ্ঞাসার সমিধ প্রদান করছেন, কী এবং কেন এই জাতীয় অসংখ্য প্রশ্নের আকারে। প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পরমার্থের সন্ধান পাচ্ছেন নানাপথে। কখনো কেউ আনন্দময় জগতের রূপে মুগ্ধ হচ্ছেন, কেউ বা দুঃখময় জগতে জন্ম-মৃত্যু

কর্মফলের বন্ধন কাটিয়ে পরম শক্তিতে লীন হয়ে জড়জগতের থেকে মুক্তির পথ খুঁজছেন। লোকায়ত সমাজ যখন মদ্যমাংসবলি, উৎসব, নৃত্যগীত, মেলা, ব্রতপালন নিয়ে মেতে আছেন, তখন নিরগ্নিক জ্ঞান-উপাসকগণ তাঁদের পরমার্থের নাম দিচ্ছেন মোক্ষ, কৈবল্য, বা নির্বাণ। জ্ঞানমার্গের ভিন্ন-ভিন্ন পথের খানিক উল্লেখ আছে বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে। গৌতমবুদ্ধের সমকালে রাজগৃহের অধিবাসীদের মধ্যে তখন ছয়জন তীর্থিকদের প্রচুর অনুগামী। পকুধ কাচ্চায়ন, বেলাট্ঠিপুত্র সঞ্জয়, মখ্খলিপুত্র গোসাল ইত্যাদির সঙ্গে আছেন নির্গ্রন্থি নাথপুত্র মহাবীর। একসঙ্গে তাঁদের ছয়বর্গীয় বলে উল্লেখ করা হয় বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে। জ্ঞানের অগ্নি থেকে উদ্ভূত হয়েছে ষড়দর্শন। সমান্তরালে আবহমানকালের জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা থেকেই উদ্ভুত হচ্ছে দুঃখের নিরসনের পথনির্দেশক বৌদ্ধ এবং জৈনদর্শন।

জিনগণের অনুসৃত সংযম এবং সদাচারআশ্রয়ী উচ্চতর জীবনমার্গের সন্ধান পেয়ে জিনধর্ম গ্রহণ করেছিলেন রাঢ়ভূমির এক জনগোষ্ঠী। তাঁদের একসময় বলা হত সুধী-ভূমিজ। পরে তাঁরা শ্রমণ শব্দ থেকে জাত সরাক নামে পরিচিত হলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় অজস্র জৈনমন্দির রচিত হয় পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায়। কালের ধর্মে জৈনধর্মের অনুগামীরা তাঁদের পূর্বের সমৃদ্ধির দিন হারিয়ে ফেলেন। কেউ মিশে যান ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিকধারায়। তবে প্রান্তিক হলেও সরাক গোষ্ঠীর মানুষেরা আজও জিনধর্মের ঐতিহ্য পালন করে চলেছেন। সার্বিক অবক্ষয়ের মধ্যেও সদাচার এবং অহিংসা ও সরল জীবনযাত্রার জন্য সমাজে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে আছেন সরাকেরা ।

কত প্রাচীন এই জৈন পরম্পরা? পন্ডিতদের অনুমান অনুসারে সিন্ধুসভ্যতার যুগেও জৈনধারার চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। সিন্ধুসভ্যতার শিবভাবনা এবং জিনধর্মের সাদৃশ্য হয়তো মজ্জাগত। বর্ধমানের বাবলাডিহি গ্রামের শান্তিনাথ শিবরূপে নির্দ্বিধায় পূজিত হন। কোথাও বা জিনগণ মিশে গেছেন ধর্মঠাকুরে। ধর্মঠাকুরের কামিন্যা হলেন যক্ষিণী মনসা। হংসবাহনা সরস্বতী এবং হংসবাহনা মনসার মধ্যে বিদ্যাদেবী মানসী ও মহামানসী হয়তো লীন হয়ে

আছেন। জৈন যক্ষিণী পদ্মাবতী মঙ্গলকাব্যের নবাগত দেবী হয়ে ওঠেন। জিনধর্মের কঠোর সাধনার স্মৃতি বেঁচে থাকে নানা কঠোর ব্রতপালন ও উপবাসের মত আত্মনিগ্রহের আকারে।

একদিকে বিমূর্ত দর্শন ও আচারবিধি, অন্যদিকে লোকপ্রিয় ধর্মাচরণ - দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটে যায় মন্দির ও সুশোভন মূর্তি প্রতিষ্ঠার রূপে। জিনগণ প্রথমে প্রতীকের আকারে পূজিত হতেন। পরে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক ধারার মতোই জিনমূর্তি সৃষ্টি হতে লাগলো। শিল্পীদের দক্ষতার বিকাশ হতে লাগলো নিরন্তর চর্চার মাধ্যমে। অন্যান্য ধারার মূর্তিলক্ষণের মতই জিনগণের সাধারণ মূর্তিলক্ষণ এবং প্রত্যেকের নিজস্ব লাঞ্ছন বিধিবদ্ধ হয়ে গেল। মূর্তিকল্পনার আদিপর্বের এক পরম সুন্দর সৃষ্টির নমুনা হল পুরুলিয়া থেকে সদ্য-আবিষ্কৃত পার্শ্বনাথের মূর্তিটি।

কে ছিলেন এই পার্শ্বনাথ? কেনই-বা তাঁর লাঞ্ছন সপ্তফণাযুক্ত নাগ? মূর্তির প্রেক্ষাপটে তাঁকে ঘিরে আছেন কারা?

এককথায় বলা যায় চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মধ্যে বাইশজন ছিলেন ইতিহাসপূর্বযুগের মানুষ। জৈনপুরাণ এবং পার্শ্বনাথচরিত এবং নানা পারিবারিক বৃত্তান্ত থেকে পাওয়া তথ্য আহরণ করে ধারণা করা হয়েছে যে পার্শ্বনাথের জন্মকাল প্রায় ৮১৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং মৃত্যুকাল আনুমানিক ৭১৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। পিতার নাম অশ্বসেন। তিনি ছিলেন বারাণসীরাজ। মাতার নাম বামা বা ব্রহ্মা। প্রায় ৩০ বছর বয়সে পার্শ্বনাথ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। প্রায় ৭০ বৎসর ধরে তিনি প্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি মোক্ষলাভ করেন দক্ষিণ বিহারের সমেতশিখর পর্বতে। তাঁর নামানুসারে পর্বতের নতুন নাম হয় পার্শ্বনাথ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিতরা অনেকেই তাঁকে জৈনধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলতে আগ্রহী, কারণ তিনিই জৈনধর্মকে একটি বিধিবদ্ধ রূপ দিয়েছিলেন।

পার্শ্বনাথের যক্ষ পার্শ্ব বা ধরণেন্দ্র। তাঁর সম্পর্কে নানা কাহিনী আছে, তবে সবগুলিই

নাগদের বশ্যতাস্বীকার সম্পর্কিত। তাঁর সাধারণ লক্ষণ হলো নাগছত্র, নাগলাঞ্ছন, এবং তিনি কূর্মবাহন। পার্শ্বনাথের যক্ষিণী পদ্মাবতী। পদ্মাবতী সর্পবাহনা অথবা কুক্কুটবাহনা। যক্ষিণী পদ্মাবতী সম্ভবত পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যের মনসায় রূপান্তরিত হন – সে-কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

গোলামারা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত মূর্তিটি বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্রে বর্ণিত লক্ষণ অনুসারে কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান, ঋজু-আকৃতি তরুণ দেহযুক্ত, শ্মশ্রুগুম্ফবর্জিত মুখমণ্ডল। পুরুলিয়ার মূর্তিটির কেশবিন্যাস এবং কর্ণের আকৃতি গান্ধারশিল্পের বুদ্ধমূর্তির অনুরূপ।

পার্শ্বনাথের ছত্র ধরেছেন সপ্তফণা নাগ, সর্বোপরি ছত্র। দুই পার্শ্বে মোট আটটি পুরুষদেবতা, সম্ভবত অষ্টদিকপাল। উপরে দুই বিদ্যাধর বন্দনারত। পার্শ্বমূর্তি ধরণেন্দ্র এবং পদ্মাবতী চৌরীধারণ করে আছেন। নিম্নভাগে নাগদম্পতি, দুই ভারবাহক এবং দুই মনুষ্য উপাসক। পৌরাণিকধারার প্লাবনে যখন সমগ্র ভারত মূর্তি ও মন্দিররচনায় মগ্ন, এই মূর্তিটি সেই স্বর্ণযুগের সৃষ্টি বলে অনুমান যাচ্ছে।

অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত মূর্তিটি কিভাবে তার আপন আলয় হারিয়ে নদীর গর্ভে স্থান পেল, উপাসকরাই বা প্রাণের ঠাকুরকে ছেড়ে কেন স্থানত্যাগ করলেন, তার ইতিহাস-অন্বেষণ এখনো বাকি আছে। বর্তমানে পার্শ্বনাথ বিষ্ণুমূর্তি-রূপে প্রতিভাত হয়েছেন সরলবিশ্বাসীর চোখে। গ্রামবাসীরা মূর্তির অধিকার ছাড়তে নারাজ। এটি একদিকে হয়তো সঠিক সিদ্ধান্ত, কারণ কলকাতার জাদুঘরের গুদামঘরের অজস্র সংগ্রহের একটি গৌণ নমুনা হয়ে থাকার থেকে আবিষ্কারস্থলে গৌরবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা অনেক ভালো। দেববিগ্রহ মিউজিয়ামে প্রদর্শনের জন্য সৃষ্টি হয় না। তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য পূজাগ্রহণ। স্বস্থানে পূজা পেলে যেমন গ্রামের গৌরব বাড়বে, তেমনই প্রাপ্তিস্থলের ইতিহাস থেকে শিকড়-বিচ্ছিন্ন হবে না মূর্তিটি। মূর্তিটিকে কেন্দ্র করে পর্যটনশিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও আছে। ফলে গ্রামও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। বিষ্ণুবিগ্রহ রূপে মূর্তিটির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করছেন গ্রামবাসীরা। এমন ঘটনা বহু স্থানেই

ঘটে, কারণ মূর্তিটি যে মূল সংস্কৃতির ফসল ছিল সেই সংস্কৃতিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নতুন সংস্কৃতির যুগে মূর্তিটির কোনও অসম্মান বা বিনষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। আবহমান ধারার প্রতি এইপ্রকার মর্যাদাদান সাবেকি ভারতীয় সংস্কৃতির আপন বৈশিষ্ট্য। তবে শেষকথা, অত্যন্ত মূল্যবান মূর্তিটির নিরাপত্তা যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেটি দেখাও স্থানীয় গ্রামবাসীদের কর্তব্য।

সহায়কসূত্র ও ব্যবহৃত গ্রন্থঃ

১। বিশ্বকোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু।

২। দি জৈন আইকনগ্রাফি, বি সি ভট্টাচার্য, ১৯৩৭

৩। সরাক সংস্কৃতি ও পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি, শ্রীযুধিষ্ঠির মাজী

৪। আচারাঙ্গসূত্র, অনুঃ হীরাকুমারী জৈন

৫। সংবাদপত্রের সূত্র।

তীর্থঙ্কর মহাবীরের মহানির্বাণ এবং তারপর

- মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

জৈনমতে, বর্তমান কালচক্রের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর। তাঁর জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে, চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশীর রাত্রিতে উত্তর-ফাল্গুনী নক্ষত্রের কালে বৈশালী নগরীর ক্ষত্রিয় কুন্ডগ্রাম নামের একটি উপনগরে এক সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারে। বৈশালীতে তখন একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহাবীর তাঁর ৭২ বছরের জীবনকাল অতিবাহিত করে খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৭ অব্দে নির্বাণ লাভ করেন। কল্পসূত্রে তাঁর নির্বাণের ইতিহাস বিধৃত রয়েছে।

"তৎপরে ভগবান মধ্যমা পাবাতে হস্তিপাল রাজার রজ্জুকসভায় শেষ বর্ষাকাল যাপন করিবার জন্য উপাগত হইলেন।" (কল্পসূত্র/১২৩)।

তীর্থঙ্কর মহাবীর জন্মেছিলেন রাজপুত্র হয়ে। তাঁর পিতা ছিলেন মহারাজ সিদ্ধার্থ, যিনি জ্ঞাত-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের রাজা ছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন মহারাণী ত্রিশলা, যিনি ছিলেন বৈশালী গণতন্ত্রের মুখ্যাধিনায়ক হৈহয় বংশীয় মহারাজ চেটকের ভগ্নী। জৈন সাহিত্যে তিনি নায়পুত্ত (ন্যায়পুত্র) এবং বৌদ্ধগ্রন্থে তিনি নাতপুত্ত (নাথপুত্র) নামে সম্বোধিত হয়েছেন; দুটিই সর্বোচ্চ সম্বোধন। রাজপুত্রের যেসব গুণ থাকা দরকার, তার সবই তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। কিন্তু তাঁর জীবন তো শুধু রাজপ্রাসাদের প্রাকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য ছিল না। তিনি এসেছিলেন মানুষকে তাঁর জীবন, কাজ ও পরিণতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দিতে। তাই ত্রিশ বছর বয়সে তিনি শ্রমণধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে রাজপ্রাসাদ, সমস্ত ভোগবিলাস, জীবনের সব স্বাচ্ছন্দ্য, প্রিয়তমা স্ত্রী যশোদা ও একমাত্র কন্যা প্রিয়দর্শনা বা অনবদ্যাকে ত্যাগ করে জগতের ও জীবনের গভীর অর্থের উন্মোচনে ব্যাপৃত হন। এক মহাজীবন অতিবাহিত করে তিনি মানব দেহ ত্যাগ করেন। বর্তমান বিহারের পাবাপুরীতে তার নির্বাণের মহাপর্বটি সঙ্ঘটিত হয়, যা স্মরণ করে আজ অবধি জৈনগণ দীপাবলী পালন করে আসছেন। কল্পসূত্র বলছে,

"সেই চাতুর্মাসের চতুর্থ মাসে সপ্তম পক্ষে কার্তিক কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশ দিবসে যে চরম

রাত্রি সেই রাত্রিতে শ্রমণ ভগবান মহাবীর কালগত হইলেন, অপুনরাবর্তরূপে ঊর্ধ্বে গমন করিলেন। জন্ম-জরা-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করিয়া সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অন্তকৃৎ, পরিনিবৃত, সর্বদুঃখপ্রহীণ হইলেন"। (কল্পসূত্র/১২৪)।

মূলতঃ জৈন মতে, শেষ তীর্থঙ্করের এই নির্বাণ লাভের কারণে এই কালচক্রের মধ্য দিয়ে মানুষের মুক্তির জন্য মহাজাগতিক জ্ঞান প্রসারের পরিপূর্ণতারও সমাপ্তি ঘটলো। কিন্তু সেইসাথে এই প্রশ্নও উদিত হলো, পরম পুরুষ মহাবীরের এই পৃথিবী ত্যাগের পর কী তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনাসমূহ ঘটলো?

অন্তিম তীর্থঙ্করের এই মনুষ্য জীবনের মহাসমাপ্তির পর পৃথিবীতে তার কিছু সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ে। যখন তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হন, কাশীদেশের নয়জন মল্ল গণরাজ এবং কোশল দেশের নয়জন লিচ্ছবী গণরাজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহাপুরুষের আলোক নির্বাপিত হওয়ার কারণে তারা সেখানে আলোকসজ্জা করলেন। তারপর থেকে আজ অবধি সেই দিওয়ালী (দীপাবলী) নামক এই দীপোৎসব চলে আসছে।

তবে মহাবীর তাঁর শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ আগেই হাতে নিয়েছিলেন। ফলে আলোক নির্বাপিত হওয়ার সুযোগ তিনি রাখেননি। ব্যাপক সংখ্যক শিষ্য ও শিষ্যা তিনি ইতোমধ্যেই তৈরী করেছেন। ইতোমধ্যে ইন্দ্রভূতি গৌতম প্রমুখ সাধু বা মুনিগণ সংখ্যায় ১৪,০০০, আর্যা চন্দনা প্রমুখ সাধ্বীর সংখ্যা ৩৬,০০০, শঙ্খ ও শতক প্রমুখ ব্রতধারী শ্রমণোপাসকের সংখ্যা ১,৫৯,০০০ এবং সুলসা, রেবতী প্রমুখ ব্রতধারিণী শ্রাবিকার সংখ্যা ৩,১৮,০০০-এ পৌঁছেছে। তবে মুনি বা সাধু, আর্যা বা সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা - জৈন সঙ্ঘের এই চার স্তরের বাইরেও অনেক শ্রদ্ধাবান অনুগামী ও অনুগামিনী ছিলেন, যাঁরা মহাবীরের শিক্ষা অর্থাৎ তাঁর দর্শন ও দেশনা কী ছিল, তা মানুষকে জানাতে ও ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে ব্রত নিয়েছিলেন। আর সঙ্ঘ সম্পর্কে আমরা জানি যে, এই সমগ্র পঞ্চম কাল সঙ্ঘ অব্যাহত থাকবে, ফলে মহাবীরের ধর্ম ও বাণীও পৃথিবীতে টিঁকে থাকবে। সঙ্ঘের পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে

তীর্থঙ্কর মহাবীরের ধর্মের সময়কালেরও অবসান ঘটবে। তবে তা বহু দূরবর্তী ঘটনা। বর্তমান অবসর্পিণীর পঞ্চম ভাগকে (দুষমা কাল) জৈন শাস্ত্রে পঞ্চম কাল বলা হয়।

এইভাবে চব্বিশতম তীর্থঙ্কর তাঁর শিক্ষাকে টিকিয়ে রাখবার ও ছড়িয়ে দেবার এক মহান ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যকর করে গিয়েছেন। জৈনমতে প্রতি কালপর্বে তীর্থঙ্করের সংখ্যা নির্দিষ্ট, আর তা ২৪ জন। এমতে মহামানব মহাবীরের মধ্য দিয়ে সেই সংখ্যা এই কালপর্বে পূর্ণ হয়েছে। আড়াই হাজার বছরের অধিক কাল ধরে তাঁর সঙ্ঘ টিকে আছে, যা পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল ও গৌরবময়। ফলে তাঁর দিব্যশক্তি থেকে বিকীর্ণ আলো যে আরো অধিক কাল জগতে থাকবে, এতে আর আশ্চর্য্যের কী আছে?

হিড়বাঁধ পরিমণ্ডলে অনালোচিত জৈন মূর্তি ও ভাস্কর্যঃ ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোকে

- সুমিত মহন্ত

রাঢ়ের মধ্যমণি বাঁকুড়া জেলার সর্বাধিক পিছিয়ে পড়া ব্লক হল হিড়বাঁধ। বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমার অন্তর্গত হিড়বাঁধ ব্লকটি বাঁকুড়া শহর থেকে দক্ষিণে ৪৩ কিমি দূরে অবস্থিত। হিড়বাঁধ ব্লকে পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মোট ১৫৫ টি মৌজা রয়েছে। পুরাভূমির অন্তর্গত এই ভূখণ্ডের উত্তরভাগে প্রবহমান শিলাবতী নদী হল এই ব্লকের সীমানা। ক্ষুদ্র ঢিবি, ক্ষুদ্র পাহাড় ও ডুংরি সমন্বিত শাল-পলাশ-চন্দন বনে ঢাকা এই এলাকা একদা প্রাগৈতিহাসিক মানবসভ্যতার বিচরণভূমি ছিল। ১৯৮১-৮২ সাল পর্যন্ত এখানে উচ্চ পুরাপ্রস্তরযুগের অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বাঁকুড়ার খাতড়া-মুকুটমণিপুর থেকে এই অঞ্চল পর্যন্ত এলাকা পুরাপ্রস্তরযুগের মানুষদের আৰাসস্থল ছিল।[1] মধ্যযুগে হিড়বাঁধ ছিল ধবলভূম জেলার এবং পরবর্তীকালে বাঁকুড়া জেলা গঠনের পূর্বে ছিল মানভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত। অতএব স্পষ্টতঃ বোঝা যায়, একদা মানভূমের জৈন কাল্ট এই ব্লকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' বা 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে এই এলাকার কোন উল্লেখ নেই। J. D. Beglar ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছেন ১৮৭১ - ৭২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি পুরুলিয়ার পাড়া থেকে পাকবিড়রা হয়ে বুধপুরের পথে ছাতনা গমন করেছেন। ফলস্বরুপ হিড়বাঁধ ব্লকের কোন আলোচনা স্থান পায়নি তাঁর বিখ্যাত ‘Report of A Tour Through the Bengal provinces' গ্রন্থে। এই প্রবন্ধেই সর্বপ্রথম হিড়বাঁধ পরিমণ্ডল জুড়ে জৈন ধর্মের মূর্তি ও ভাস্কর্য আলোচিত হল।

ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান:

এই ব্লকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতীব মনোহর। এলাকার ভূমি মুলতঃ রুক্ষ প্রকৃতির ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় নির্মিত। মৃত্তিকার বুকে শাল, পিয়াল, পলাশ, চন্দন গাছের সমারোহ। উত্তরে শিলাবতী প্রবাহিত। এই নদীর গায়ে জুনবেদিয়া (J. L. No 66) গ্রামে ভগ্নপ্রায় জৈন মন্দির ও মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। হিড়বাঁধ ব্লক অফিসের উত্তরপূর্বে তেঁতুলিয়া গ্রামে ভবানী পাহাড় এবং পাশে কদম দেউলীর জলাধার অবস্থিত। কদম দেউলীর জলাধারের কাছে পাওয়া

গেছে প্রাচীন প্রস্তর যুগের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। হিড়বাঁধ গ্রামের পশ্চিমে ২০ কিমি অতিক্রম করলেই পাওয়া যাবে কাঁসাই নদীর তীরে অবস্থিত বুধেশ্বর মন্দির। আবার ১০ কিমি পশ্চিমে গেলে পাকবিড়রা। এই ব্লকের দক্ষিণে রয়েছে খাতড়া ও অম্বিকানগর। এই ব্লকের চতুঃসীমা জুড়ে যে ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ রয়েছে, তাতে এটা স্পষ্ট যে, একদা এখানে জৈনধর্ম ও জৈনসংস্কৃতির এক সুসমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। বহু জৈন মন্দির ও মূর্তি আজও তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। অতএব জৈন বেষ্টনীর মধ্যমণি হিড়বাঁধ ব্লকের গ্রামে গ্রামে যে জৈন মূর্তি পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

জৈন ধর্ম ও বাঁকুড়াঃ

বাংলায় জৈন ধর্ম যে বৌদ্ধ ধর্ম অপেক্ষা সুপ্রাচীন এ নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। বৌদ্ধ 'দিব্যাবদান' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মহারাজ অশোকের সময়ে খ্রিস্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে উত্তরবঙ্গে পৌণ্ড্রবর্ধনে জৈনদের খুবই প্রভাব ছিল।[2] J. D. Beglar-এর মতে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলে জৈন ধর্মাবলম্বীদের বসবাস শুরু হয়। তিনি মনে করেছেন এই এলাকার জৈন ধ্বংসাবশেষ গুলি খ্রিস্টীয় ১০ম শতকের[3]। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে, বাঁকুড়া জেলায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে জৈন ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়[4]। হিউয়েন সাঙের বিবরণে জানা যায় যে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকেও পূর্ব ভারতে জৈন ধর্ম যথেষ্ট প্রবল ছিল।[5] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- "প্রথম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জৈন ধর্ম এখানকার প্রধান ধর্ম ছিল। এই কারণে বাঁকুড়া, মানভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ময়ূরভঞ্জের উত্তর ভাগে বৌদ্ধ কিম্বা হিন্দু মূর্তি অপেক্ষা জৈনমূর্তিই বেশি দেখা যায়।"[6] মানিকলাল সিংহের মতে, বাঁকুড়ার জৈন সভ্যতার বিকাশ হয় অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গের আমলে। তিনি পার্শ্বনাথের উপাসক ছিলেন।[7]

আমাদের আলোচ্য ভূখণ্ড হিড়বাঁধ দক্ষিণ বাঁকুড়ার অন্তর্গত। মানভূম অঞ্চলের পথ ধরে এখানে জৈন ধর্মের বিস্তার হয়েছিল আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত। দক্ষিণ বাঁকুড়া অঞ্চলে জৈনধর্মীয় নিদর্শনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। সম্ভবত পাল সেন যুগে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থান-পতন চলতে থাকে, তখন সম্ভবতঃ দুর্গমতার কারণেই এইসব অঞ্চলে পূর্বতন জৈন প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।[8] জৈন বণিকরা বাঁকুড়ার নদীপথে ব্যবসা

বাণিজ্য করত। তাই দ্বারকেশ্বর, কাঁসাই, শিলাই, দামোদর, প্রভৃতি নদীপথ ধরে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালিত হত। সময়টা ছিল দশম থেকে দ্বাদশ শতক।[9] তাই নদী উপত্যকা জুড়ে নির্মিত হয়েছিল বহু জৈন বিশ্রামাগার। বণিকদের পূজা ও উপাসনার প্রয়োজনে নির্মিত হয় অনেক মন্দির এবং স্থাপিত হয় অনেক প্রতিমা। জৈন মন্দির ও মূর্তিগুলোর উপস্থিতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদীর উপত্যকা অঞ্চলে দেখা যায়। হিড়বাঁধ ব্লকের শিলাবতী নদীর তীরে বেশ কিছু জৈন মন্দির ও মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। ২০২০ সাল থেকে গ্রামে গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা চালিয়ে যে সব জৈন মূর্তি পেয়েছি তার মূর্তিতাত্ত্বিক বিবরণ নিম্নরূপ।

জুনবেদিয়া:

শিলাবর্তীর বাম তীরে জুনবেদিয়া (J. L. No- 66) গ্রামটি অবস্থিত। শিলাবতীর নদীতীরে বহু প্রাচীন কাল থেকে মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। শিলাবতী অববাহিকায় সঞ্চিত রয়েছে আর্কিয়ান যুগের নিস নামে এক রূপান্তরিত শিলার স্তর। শিলার প্রাচুর্যের জন্য নদীর নাম শিলাবতী।[10] জুনবেদিয়া গ্রামটি ইন্দপুর ব্লকের অন্তর্গত হলেও হিড়বাঁধ ব্লকের শেষ সীমা শিলাবতীর তীরে উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল বলে প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনার দাবী রাখে। ইন্দপুর থেকে ১৫ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে ইন্দপুর-মলিয়ান মেন রোডের গায়ে জুনবেদিয়া গ্রামটি অবস্থিত। এই গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রত্নস্থলটি রয়েছে। শিলাবতীর বাম তীরে নদী থেকে প্রায় ১০০ ফুট উঁচুতে একটি প্রাচীন মন্দিরের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেছে, যার আয়তন প্রায় ৫০০ বর্গ ফুট। এখানে উঁচু ঢিবির ওপর ইটের গাঁথুনি আর কয়েকটি ভাঙা ইমারতের চিহ্ন রয়েছে। এই প্রত্নস্থল সম্পর্কে 'Archaeology of Bankura' ASI report (A.D.1300) থেকে জানা যায় - "In the center of the Temple there is a whole or chamber called the garbhakunda. Some small pieces of stone images are lying in a row around the garbhakunda. Among these sculptural pieces, the image of Ganesa and the dhyani image of a Tirthankara may be identified." স্থানীয়রা এই মন্দিরকে বুদ্ধ মন্দির বলেন। প্রাপ্ত মূর্তিগুলোকে বৌদ্ধ মূর্তি বলে ভুল করেছেন গ্রামবাসীরা। আমাদের অনুমান ধ্যানরত অবস্থায় যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্তিটি হল ২৪তম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের। Jaina iconography অনুযায়ী ঋষভনাথ, নেমিনাথ ও মহাবীর, এই তিনজন তীর্থঙ্কর ধ্যানরত

অবস্থায় পদ্মর ওপর উপবিষ্ট। বাকি তীর্থঙ্করগণ দণ্ডায়মান। এই ধ্যানমুদ্রায় মহাবীরের মূর্তিটি গুপ্ত অথবা গুপ্ত-পরবর্তী যুগের হতে পারে। কারণ কালো ক্লোরাইটের এই মূর্তিটি প্রস্ফুটিত বিশ্বপদ্মের ওপর ধ্যানরত; মূর্তির আশেপাশে কোথাও কোন বিদ্যাধর, বিদ্যাধরী, নবগ্রহ, শাসনদেবতা বা শাসনদেবী অনুপস্থিত। কুষাণ আমল থেকেই মহাবীরের প্রাচীনতম মূর্তি নির্মাণ শুরু হয়।[12] মথুরা শুঙ্গ-কুষান শিল্প রীতির জৈনমূর্তিতে শ্রীবৎস চিহ্ন এবং ধ্যানমুদ্রার প্রবর্তন হয়। দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তির সাথে প্রতীক চিহ্নাদি, ধর্মচক্র, নির্দিষ্ট যক্ষ ও যক্ষিণী এবং তাঁদের প্রতীক বৃক্ষাদি উৎকীর্ণ করা হত।[13] যোগাসনে উপবিষ্ট আলোচ্য মূর্তিটির দুটি কর্ণ অপূর্ব কর্ণকুণ্ডল দ্বারা অলংকৃত; বুকে শ্রীবৎস চিহ্ন। মূর্তির প্রভামণ্ডল দিব্য জ্যোতির্ময়। সিঁদুর লেপনের ফলে লাঞ্ছন চিহ্ন বোঝা কষ্টকর। তাই জোর দিয়ে বলা যায় না যে, এই মূর্তিটি গুপ্ত বা তার পরবর্তী যুগের মহাবীরের মূর্তি। ধ্যানী মূর্তির পাশে রয়েছে বেশ কিছু ভগ্ন জৈন মূর্তি। এছাড়া জৈনযুগের পূজিত একটি গণেশ মূর্তি রয়েছে। জৈনরা যে গণেশ পূজা করত, তার বহু প্রমাণ মেলে বাঁকুড়া জেলার নদীতীরবর্তী প্রত্নস্থলগুলিতে। এ প্রসঙ্গে B. C. Bhattacharya'র বিবৃতিটি স্মরণযোগ্য- "Ideas of auspiciousness, prosperity, wealth, kingly splendour or so on found a direct outlet in the sculptor's art-in the images of Gaṇeśa, Śri, Kubera, Indra. The long-standing traditions and well-established images of these gods in Brāhmanism directly appealed to the Jainas ....."[14]. ব্রাহ্মণ্যধর্মের বহু দেবতা সে যুগে জৈন ধর্ম জীবনে অনুপ্রবেশ করেছিল।

দেউলী:

শিলাবতীর দক্ষিণ তীরে একেবারে নদীর গায়ে দেউলী (J. L. No- 025) মৌজার অন্তর্গত মাকড়াসিনি থান হল জৈন প্রত্নস্থল। অজস্র পোড়া মাটির হাতি ঘোড়ার পাশে পূজিত কিছু ভগ্ন জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি। এখানে কোন পূর্ণাবয়ব জৈন মূর্তি নেই। ভগ্ন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মূর্তি গুলোর লাঞ্ছন চিহ্ন নেই বলে মূর্তিগুলোকে চিহ্নিত করা মুশকিল। পৌষ মাসে মকর সংক্রান্তির দিন থেকে এখানে মাকড়া মেলা বসে। মেলা চলাকালীন মাকড়াসিনি নামে পূজিত হন ভগ্ন জৈনমূর্তিগুলি। পূজা করেন দেউলি গ্রামের ভূমিজরা, যাদের লায়া বলা হয়।

মলিয়ান:

শিলাবতীর দক্ষিণ পূর্বে প্রায় ১ কিমি দূরে মলিয়ান (J. L. No- 023) গ্রামের শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি শিবমন্দিরে ভৈরব নামে পূজিত হন জৈনদের আদিতম তীর্থঙ্কর আদিনাথ বা ঋষভনাথ। গম্বুজাকৃতি এই মন্দিরটি ২০০-২৫০ বছরের বেশী প্রাচীন নয় বলেই অনুমিত হয়। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী; একটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। মন্দিরটি নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। নবনির্মিত মন্দিরের খিলান অর্ধবৃত্তাকার বা গোলাকার আর্কের মতো। শিবলিঙ্গের পাশে জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের মূর্তিটির লাঞ্ছন চিহ্ন ষণ্ড বা ষাঁড়। মূর্তিটি যেমন মূল্যবান তেমনি এর শিল্পকলাও অপূর্ব সুষমামণ্ডিত। কালো ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত মূর্তিটির দৈর্ঘ্য ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১ ফুট ৯ ইঞ্চি। মূর্তিটির নির্মাণকাল সম্ভবত একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। মূর্তিটির সপ্ত সংখ্যা বিশিষ্ট অপূর্ব জটামুকুট দুই স্কন্ধকে আচ্ছাদন করেছে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত অধিকাংশ ঋষভনাথ মূর্তির মতো। অপূর্ব মুখমণ্ডল, প্রশস্ত কপাল, উন্নত নাসিকা, অনিন্দনীয় চক্ষুদ্বয়। মস্তকের উপরিভাগে ত্রিফলা ছত্রের আবরণ। ছত্রের দুই পাশে উড্ডীয়মান দুই বিদ্যাধর বিদ্যাধরী যাদের হস্তে পুষ্পমালা সুশোভিত। মস্তক থেকে স্কন্ধ পর্যন্ত মাধুর্যমণ্ডিত করেছে আলঙ্কারিক অপূর্ব প্রভামন্ডল। মূর্তির উত্তর পাশে বিদ্যমান ২৪ জন তীর্থঙ্কর। মূর্তির ডান ও বাম পাশে ১২টি সারিতে দুটি করে কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় নগ্ন তীর্থঙ্করমূর্তি অনুভূমিক তলে সুসজ্জিত। মূর্তিগুলির পাদপীঠে রয়েছে উপযুক্ত লাঞ্ছন চিহ্ন। মূল ঋষভনাথ মূর্তিটির আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়, দ্বিস্তরীয় পদ্মের ওপর কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। পদতলের দুই পাশে কোমরে হাত রেখে দুজন জিনসেবক দণ্ডায়মান। মূর্তির বাম পাশে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র ব্যতিক্রমী অম্বিকা মূর্তি। ললিতা আসনে উপবিষ্টা অম্বিকা মূর্তিটির মস্তকের ওপরে জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মূর্তি। দ্বিভুজা অম্বিকা সিংহবিধৃত পদ্মাসনে অধিষ্ঠিতা। দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে জ্যেষ্ঠপুত্র শুভঙ্কর দণ্ডায়মান। বাম ক্রোড়ে উপবিষ্ট প্রভংকর। এছাড়া ক্ষুদ্র জৈন দেবী মূর্তি এবং একটি গণেশ মূর্তি পরিলক্ষিত হয় মূল মূর্তির পদতলে। জনশ্রুতি যে, আলোচ্য জৈন মূর্তিটি ৪ কিমি দূরে কেদিয়া গ্রামের পুকুর থেকে আনা হয়েছিল। এছাড়া এই গ্রামের শ্যামাপদ ধীবরের বাড়ির মনসা থানে পূজিত হয় ভৈরব নামে এক জৈন হিরোস্টোন। হাতে তরবারি নিয়ে যুদ্ধরত ভঙ্গিমার দণ্ডায়মান মূর্তিটি কালো ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত। এর দৈর্ঘ্য ১ ফুট এবং প্রস্থ ৬ ইঞ্চি।

কেদিয়া:

মলিয়ান থেকে পূর্বে ৩ কিমি দুরে কেদিয়া (J. L. No - 017) গ্রামের অবস্থান। এই গ্রামের আদি

বাসিন্দা ভূমিজ সম্প্রদায়। এটি হিড়বাঁধ ব্লকের উল্লেখযোগ্য জৈন প্রত্নস্থল। এখানে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে জৈন যুগের হিরোস্টোন। যার দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ও প্রস্থ ১ ফুট ৩ ইঞ্চি। মূর্তির পাশে রয়েছে মন্দিরের একটা আমলক শিলা। এতে অনুমান করা যায় যে এই গ্রামে প্রাচীন জৈনমন্দির ছিল। এই গ্রামের পুকুর থেকে একটি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি পাওয়া যায়, যা মলিয়ান গ্রামে শিবমন্দিরে রাখা হয়েছে। অতীতে সুকঠিন সরাক আদিবাসীদের বজ্রভূমিজ বলা হত। সরাকরা জৈন ধর্মের উপাসক। এই বজ্রভূমিজ কালক্রমে ভূমিজ জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল বলে অনুমান। তাই ভূমিজ গ্রাম গুলিতে জৈন মূর্তি ও মন্দিরের সন্ধান মেলে।

পাকুড়িয়া:

কেদিয়া গ্রামের উত্তরে শিলাবতীর ডান তীরে অবস্থিত গ্রাম হল পাকুড়িয়া (J. L. No - 018)। এখানে শিলাবতীর তীরে অতি ক্ষুদ্র জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি পাওয়া গেছে। এই গ্রামের গোয়ালা জাতির জনৈক ব্যক্তি মুর্তিটিকে গৃহে প্রতিষ্ঠা করে ভৈরব নামে পুজা করেন। হাতের মুঠোয় তীর্থঙ্কর মুর্তিটি ধরা যায়। অতিরিক্ত সিঁদুর লেপনের ফলে মুর্তিটির লাঞ্ছন চিহ্ন বোঝা যায় না। তাই মুর্তিটি কোন তীর্থঙ্করের, তা বোঝা মুশকিল।

ভোজদা:

খাতড়া শহর থেকে ৮ কিমি এবং বাঁকুড়া শহর থেকে ৪১ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত ভোজদা গ্রামের (J. L. No -147) শিবমন্দিরে রয়েছে বেশ কিছু পূর্ণাবয়ব ও ভগ্ন জৈন মূর্তি। এই গ্রাম জৈনযুগের খুব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। ভোজদা গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সাংড়া নামক প্রাচীন পুষ্করিণী থেকে অতীতের ধর্মচর্চা কেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ ও অনেক মূর্তির ভগ্নখণ্ড উদ্ধার করা হয়েছে। পুষ্করিণীর দক্ষিণ তীরে একটি জৈন মঠ ছিল। সম্ভবত কালাপাহাড় আগুন লাগিয়ে মঠটিকে পুড়িয়ে ফেলে। পুষ্করিণীর নামকরণেও তার পরিচয় পাই সাঙ্গারা > সাংড়া।[16]

মূর্তিগুলির মধ্যে রয়েছে পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ ও ঋষভনাথের ভগ্ন মূর্তি।[17] এছাড়া একটি যক্ষিণী মূর্তি ও অন্যান্য প্রত্নসামগ্রীও এখানে পাওয়া গিয়েছিল। উদ্ধার করা হয়েছিল কড়ি, মুদ্রা, কাঠকয়লা, ছাই, হাড়গোড়।[18] মন্দিরে শিবলিঙ্গের পাশে শান্তিনাথ মুর্তিটির দৈর্ঘ্য ২ ফুট ৪ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১ ফুট ৩ ইঞ্চি। মুর্তিটির মস্তকে রত্নখচিত কুণ্ডল, মস্তকের উপরিভাগে ত্রিফলা ছত্র। মস্তকের উপরিভাগের ডানদিকে উড্ডীয়মান বিদ্যাধর; কিন্তু বামদিকে ভগ্ন হওয়ার কারণে বিদ্যাধরী অদৃশ্য। মূর্তির ডান ও বাম পাশে নবগ্রহের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ডানদিকে পাঁচটি এবং বামে চারটি গ্রহদেবতার অবস্থান। মূর্তির পদতলে দু'পাশে কোমরে দু'হাত রেখে জিনসেবক দণ্ডায়মান। তীর্থঙ্করের পাদপীঠ অতিরিক্ত সিঁদুর লেপনের জন্য বোধগম্য নয়। তবে নীচে হরিণের লাঞ্ছন চিহ্নের দুই পাশে দু'জন করে জিন সেবিকা নমস্কার ভঙ্গিতে উপবিষ্টা। পাশে সর্পফণা সমন্বিত তীর্থঙ্কর মূর্তিটি হল পার্শ্বনাথের প্রাচীনতম মূর্তি। এ ধরণের মূর্তি কুষাণ আমল থেকে প্রচলিত হয়।[19] এই রীতি দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলে। আলোচ্য জৈন মূর্তিগুলি দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর বলে আমাদের অনুমান। এছাড়াও, ভোজদার মহাপ্রভু থানে রয়েছে একটি ভগ্ন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি।

কুচিয়াড়া :

খাতড়া শহর থেকে ৭ কিমি উত্তরে এবং বাঁকুড়া শহর থেকে ৪০ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত কুচিয়াড়া গ্রামের প্রান্তে এক প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের তলার জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তির অবস্থান। লাঞ্ছন চিহ্ন দেখে বোঝা যায়, মুর্তিটি আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের। মুর্তিটির নির্মাণকাল আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান মূর্তিটির দৈর্ঘ্য ৩ ফুট ও প্রস্থ ১ ফুট ৩ ইঞ্চি। মস্তকের উপরিভাগে গোলাকার ছত্র। অপূর্ব কর্ণকুণ্ডল কর্ণদ্বয়কে আচ্ছাদন করেছে। মস্তকের প্রভামণ্ডল গোলাকার, ত্রিরেখা বিশিষ্ট। ছত্রের দুপাশে রয়েছে উড্ডীয়মান বিদ্যাধর বিদ্যাধরী। মুর্তিটির বক্ষ প্রশস্ত, বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, আজানুলম্বিত বাহু, দুই স্কন্ধের পাশে দু'টি ত্রিভুজ বিদ্যমান। মূর্তির দুপাশে ২৪ জন তীর্থঙ্করের নগ্ন মূর্তি দণ্ডায়মান। ডান পাশে ৬টি ও বাম পাশে ৬টি করে বর্গাকার সারিতে ২৪ জন তীর্থঙ্কর অনুভূমিক তলে সুসজ্জিত। পদতলে দুই জিন সেবক ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় কোমরে হাত রেখে দণ্ডায়মান। পাদপীঠ অস্পষ্ট, তবে

নিম্ন ভাগে লাঞ্ছন চিহ্ন ষণ্ড পশ্চাৎ-অভিমুখী। ষণ্ডের দুইদিকে হাঁটু মুড়ে নমস্কার ভঙ্গিতে দুই নারী মূর্তি উপবিষ্ট।

খাঁদারাণী:

খাতড়া শহর থেকে পশ্চিমে ১২ কিমি দুরে খাঁদারাণী গ্রাম (J. L. No - 155) ছিল জৈন যুগের বিশ্রামাগার। এই গ্রামের উত্তরে প্রবাহিত হয়েছে কাঁসাই নদী। নদীপথের পাশেই ছিল জৈন বিশ্রামাগার। এই গ্রামে ব্রিটিশ আমলের একটি ভগ্নপ্রায় মন্দিরের গর্ভগৃহে পূজিত হন ভগ্নপ্রায় জৈন মূর্তি। পুজো করেন লাগারডি গ্রামের ষাটোর্ধ্ব পুরোহিত কিষন গোস্বামী। ভগ্ন জৈন মুর্তিটি কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমার দণ্ডায়মান। মুর্তিটি হাঁটুর উপরের অংশ থেকে সম্পূর্ণ ভগ্ন। পদতলে দুজন জিনসেবক কোমরে হাত রেখে দণ্ডায়মান। এর পাশে একটি অর্বাচীন পাথরের হনুমান মূর্তি রয়েছে। পূজক গোস্বামী মহাশয় মাটির তলার কোন ফসল এবং আমিষ ভক্ষণ করেন না। এতে অনুমিত হয় যে, জৈন ধর্ম বাঁকুড়াতে চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের স্রোতে বৈষ্ণব ধর্মে বিলীন হয়েছিল। জৈনধর্মের বিবিধ লক্ষণ বৈষ্ণব ধর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে।

মশিয়াড়া:

হিড়বাঁধ ব্লকের বর্ধিষ্ণু গ্রাম মশিয়াড়াতে (J. L. No - 054) সায়ন্তনী রায় নামে জনৈকা ছাত্রী একটি চৌমুখ জৈনমূর্তির সন্ধান দিয়েছিল। কাঁসাই নদী থেকে ট্রাক্টরে বালি নিয়ে আসার সময় মূর্তিটি উঠে আসে। সাদা চুনাপাথরে তৈরি মূর্তিটির দৈর্ঘ্য ১ ফুট ১ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ১ সেমি। কুষাণ আমল থেকে জৈন চৌমুখ নির্মাণ শুরু হয়।[20] জৈন চৌমুখ সম্পর্কে B. C. Bhattacharya বলেছেন- "In place of the Brāhmanic Trimurti, there is the Jaina Quadruple, popularly known as "Caumukhī". It has the further name of Sarvatobhadra-Pratimā i.e. auspicious from all sides".[21] এই চৌমুখকে জৈনরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক বলে মনে করেন। শ্রমণ বা ভ্রাম্যমান জৈন সন্ন্যাসীরা এই চৌমুখী গৃহে রেখে অথবা বাইরে বহন করে এনে পূজার্চনা করতেন।[22]

আলোচ্য জৈন চৌমুখীটি উৎকৃষ্ট শিল্পকলার নিদর্শন। এই ক্ষুদ্র চৌমুখী মন্দিরের চার খাপে কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় চার জৈন তীর্থঙ্কর বিদ্যমান। লাঞ্ছন চিহ্ন ভগ্নপ্রায় তবু অনুমান করা যায়,

মূর্তিগুলি সম্ভবত শান্তিনাথ, পার্শ্বনাথ, চন্দ্রপ্রভ এবং ঋষভনাথের। মন্দিরটি ক্ষুদ্র রেখ দেউল এবং ত্রিরথশৈলী বিশিষ্ট। তবে মন্দিরে আমলক বা কলস কোনটাই নেই।

পাইড়া:

মশিয়াড়া থেকে প্রায় ২ কিমি দূরে পাইড়া (J. L. No.- 044) গ্রামের প্রান্তে অশ্বত্থ গাছের তলায় একটি শিবলিঙ্গের পাশে ভগ্নপ্রায় জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি রয়েছে। কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান নগ্ন তীর্থঙ্কর মুর্তিটির পাদপীঠ এবং বুকের ওপরের অংশ সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন। তাই তীর্থঙ্কর মুর্তিটি সনাক্ত করা কষ্টকর। তবে মূর্তির বাম পাশে নবগ্রহের অবস্থান অনুমান করা যায়।

বসন্তকুমারী:

বহড়ামুড়ি (J. L. No - 091) অঞ্চলের বেঞ্জটাবনী গ্রামে বসন্তকুমারীর পুজো হয়। প্রথমে এই দেবীর নাম ছিল শীতলা, পরে বসন্ত রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এর নাম দেওয়া হয় বসন্তকুমারী। এখানে সংক্রান্তির দিন পূজা হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূজা করেন দেবী দুর্গার ধ্যানমন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে। ছাগবলিও হয়। বসন্ত কুমারী আসলে একটি ভগ্নপ্রায় জৈন তীর্থঙ্করের দণ্ডায়মান মূর্তি। দ্বিখণ্ডিত মূর্তিটির লাঞ্ছন চিহ্ন স্পষ্ট বোঝা যায় না বলে এটি কোন তীর্থঙ্করের মূর্তি, তা অনুমান করা খুব মুশকিল। ভগ্নপ্রায় মূর্তির বুক থেকে মাথা পর্যন্ত সুস্পষ্ট দেখা যায়। রত্নখচিত কর্ণকুণ্ডল কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত। মস্তকের প্রভামণ্ডল সুন্দরভাবে সজ্জিত বৃত্তাকার রেখাসমূহে অঙ্কিত।

উপসংহার:

হিড়বাঁধ পরিমণ্ডল জুড়ে যে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জৈন ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল, তার প্রমাণ ঐ জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তিসমূহ। এখনো এই ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম ও ব্যক্তির নামের মধ্যেও জৈন সংস্কৃতির অবশেষ রয়েছে। যেমন জুনবেদিয়া গ্রামের নামের মধ্যে জৈন থেকে জুন এবং বুদ্ধ থেকে বেদিয়া শব্দটি এসেছে বলে আমাদের অনুমান। এখানে নামের মধ্যাংশে যে চন্দ্র, নাথ, প্রভৃতি দেখা যায় তা জৈন প্রভাবের ফল বলে অনেক পণ্ডিত মনে

করেন।[23] এছাড়াও আমাদের অনুমান, এই ব্লকে বহুল প্রচলিত 'তাপস' নামটিও জৈন প্রভাবের ফল। বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলে জৈন মূর্তি নির্মাণে পালযুগের শিল্পরীতি অনুসৃত হলেও পালযুগ বা সেনযুগের বিশেষ কোন প্রভাব এই অঞ্চলের মূর্তিকলায় পরিলক্ষিত হয়নি। এই ব্লকের জনজীবনে দুধের মনুই অন্যতম প্রসাদ। এটিও জৈন সংস্কৃতির ফল বলে আমাদের অনুমান। এই ব্লকের কিছু গ্রামে গোস্বামী - বৈষ্ণব জাতির মানুষ আছেন, যাঁরা মাটির তলার কোন খাদ্য গ্রহণ করেন না। আমাদের অনুমান, জৈনধর্ম একদা এই অঞ্চলের বৃহত্তর লোকধর্ম ছিল, পরে বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করলে তার প্রভাবে অনেক জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তাই বৈষ্ণবধর্মের লোকাচারে আজও জৈনধর্মের অহিংসাবাদ প্রতিধ্বনিত হয়। ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন, বেদ-বিরুদ্ধ ধর্মদেশক প্রাকৃত ভাষাকে এক সময় বাংলাদেশ জৈন ভাষা বলে জানত। বহু জৈন শব্দ এখনও বাংলাতে চলিত। এখনো গ্রামের হরিমেলায় ছাদের নিচে ছোট ছোট চতুষ্ক বা ছয় কোনা মণ্ডপ রয়েছে। এই মণ্ডপগুলির সাথে জৈন নিবেদন দেউলের মিল খুঁজে পেয়েছেন অধ্যাপক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়।[24] স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে আসা অসঙ্গত হবে না যে, শ্রীচৈতন্যদেবের বহু আগে এই ব্লকের মানুষকে অহিংসাবাদের বাণী শুনিয়েছিল জৈন ধর্ম এবং এই এলাকার মানুষ জৈনধর্মকে গ্রহণ করেছিল সাগ্রহে এবং স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে।

তথ্যসূত্রঃ

১। চক্রবর্তী দিলীপকুমার। ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস। সেপ্টেম্বর ২০১৯, আনন্দ পাবলিশার্স। পৃষ্ঠা- ৩০।

২। কল্পসূত্র । শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় অনূদিত। ১৯৪৬, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠা-৬-৭।

৩। Patil Dr. The Antiquarian Remains in Bihar, Patna, 1963, page no- 72

৪। বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয়কুমার। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি।মাঘ, ১৩৭৭, পূর্ত বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা- ৩।

৫। সরাক সংস্কৃতি ও বঙ্গদেশে জৈন ধর্ম। সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১লা জানুয়ারি, ২০০০। জৈন ভবন। কলিকাতা। পৃষ্ঠা- ৭৭

৬। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের শিল্প। প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৭। পুনর্মুদ্রণঃ ইতিহাস চিন্তা, পৃষ্ঠা- ১৭৮।

৭। সিংহ মানিকলাল, পশ্চিম রাঢ় সংস্কৃতি। ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, দি নিউ মিনার্ভা প্রেস।পৃষ্ঠা- ১০৬।

৮। পশ্চিমবঙ্গ জেলা সংখ্যা; বাঁকুড়া। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃষ্ঠা - ৪১।

৯। ভট্টাচার্য তরুণদেব- পশ্চিমবঙ্গ (বাঁকুড়া সংখ্যা)। ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড। পৃষ্ঠা- ৩০৯।

১০। সিংহ মহাপাত্র রামামৃত। শিলাবতী উপত্যকার লোকায়ত প্রত্নজীবন। ২০২০, পৃষ্ঠা- ১২।

১১। "Archaeology of Bankura' chapter VII TILL CAD 1300 ASI, Calcutta, page no - 249

১২। প্র তিবারি মারুতি নন্দনপ্রসাদ। জৈন প্রতিমা বিজ্ঞান।২০২২। পার্শ্বনাথ বিদ্যাপীঠ, পৃষ্ঠা-১৩৬ ।

১৩। মণ্ডল কৃষ্ণকালী। সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি ভাস্কর্য। অক্টোবর, ২০১০। নব চলন্তিকা। পৃষ্ঠা- ২২৭।

381 Bhattacharya B.C. The Jaina Iconography. Second edition- Delhi, 1971. Page no- 14.
১৫। সরাক সংস্কৃতি ও বঙ্গদেশে জৈন ধর্ম।সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক)। ২০০০। জৈন ভবন, কলিকাতা - ৭০০০০৭, পৃষ্ঠা- ৪
১৬। কাঁসাই-কুমারী-সম্পাদক ডঃ বাবুলাল মাহাতো ও প্রকাশ দাস বিশ্বাস, মহকুমা শাসকের কার্যালয়, খাতড়া, জানুয়ারি, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩১১ ।
১৭। রাঢ় বাংলায় জৈন অবশেষ- সুশীলকুমার বর্মণ, ফেব্রুয়ারি ২০২২, আনন্দ প্রকাশন, পৃষ্ঠা- ১৩৭।
১৮। তদেব
১৯। প্র তিবারি মারুতি নন্দনপ্রসাদ। জৈন প্রতিমা বিজ্ঞান।২০২২। পার্শ্বনাথ বিদ্যাপীঠ। পৃষ্ঠা- ১২৩।
২০। Shah U P. Studies in Jaina Art, Varanasi 1955. page-11-12.
২১। Bhattacharya B.C. The Jaina Iconography. Delhi-1974. page-34.
২২। মণ্ডল কৃষ্ণকালী- সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি ভাস্কর্য। ২০১০, নব চলন্তিকা। পৃষ্ঠা- ২২৭।
২৩। সরাক সংস্কৃতি ও বঙ্গদেশে জৈন ধর্ম। সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পাদক)। ২০০০, জৈন ভবন, কলিকাতা।পৃষ্ঠা- ১০৫ ।
২৪। বাঁকুড়ার খেয়ালী; সংকলন ২০১৪। গিরিন্দ্র শেখর চক্রবর্তী (সম্পাদক)। বাঁকুড়া। পৃষ্ঠা- ৪২৭।

অঞ্জন চোরের কথা

- জয়শ্রী লাহা

আমাদের এই ভারতবর্ষে বহু সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপদ মগধ। মগধ দেশের রাজগৃহ নগরে একজন বড় শেঠ ছিলেন; তাঁর নাম ছিল জিনদত্ত।বড়ই ধর্মাত্মা ছিলেন শেঠ জিনদত্ত। তিনি নিয়মিত জিন ভগবানের পুজো করতেন, দীনদুঃখীদের অকাতরে দান করতেন, শ্রাবকের পালনীয় ব্রতসমূহ নিষ্ঠাভরে পালন করতেন। এর ফলে তিনি যে শুধু ধীরস্থির ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন, তা'ই নয়, তাঁর মন সর্বদাই থাকত প্রশান্ত; বিষয়ভোগের প্রতিও তাঁর কোনো আসক্তি ছিল না।

একদিন শেঠ জিনদত্ত চতুর্দশী তিথির মধ্যরাত্রে শ্মশানে গিয়ে কায়োতসর্গ মুদ্রায় ধ্যানে লীন ছিলেন। এমন সময় অমিতপ্রভ এবং বিদ্যুৎপ্রভ নামক দু'জন দেবতা সেখানে উপস্থিত হলেন। অমিতপ্রভ ছিলেন জৈন ধর্মের অনুরাগী কিন্তু বিদ্যুতপ্রভ'র অনুরাগ ছিল অন্য কোনো ধর্মের প্রতি। উভয়েরই পরস্পরের ধর্মে কোনো আস্থা ছিল না। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে তর্ক করছিলেন, একে অপরের ধর্মের পরীক্ষাও করেছিলেন; কিন্তু সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌঁছতে পারছিলেন না। ফলে তাঁদের আস্থা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ছিল। শ্মশানে এসে তাঁরা ধ্যানমগ্ন জিনদত্তকে দেখতে পেলেন।

তখন অমিতপ্রভ বিদ্যুতপ্রভকে বললেন, "হে প্রিয় বন্ধু! উৎকৃষ্ট চারিত্র পালনকারী সত্যিকারের জৈন সাধুর কথা বাদই দিলাম। তুমি ঐ কায়োৎসর্গে ধ্যানরত ঐ গৃহী মানুষটিকেই দেখ। যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহলে তুমি একেই তাঁর ধ্যান থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা কর। যদি তুমি ওকে ধ্যান থেকে টলাতে পার, তাহলে আমি তোমার কথা মেনে নেব; তোমার ধর্মকেই সত্যধর্ম বলে স্বীকার করব"। অমিতপ্রভর কথা শুনে বিদ্যুৎপ্রভ খুব উৎসাহের সঙ্গে জিনদত্তের উপর বিভিন্ন উপদ্রব শুরু করল। ভয়ানক সে সব অত্যাচার। অসহনীয় সেই সব অত্যাচারের মুখে পর্বতের মত অচল ও অটল হয়ে রইলেন শেঠ জিনদত্ত। এই সব উপদ্রব তাঁর উপর সামান্যতম প্রভাবও ফেলতে পারল না। হতাশ হয়ে নিরস্ত হতে হল বিদ্যুতপ্রভকে। ইতিমধ্যে রাত কেটে ভোর হয়ে এসেছে। শেঠ জিনদত্তের উপসর্গ সহন করার অসীম ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে দেবতা দুজন ছদ্মবেশ ত্যাগ করে নিজেদের স্বরূপে তাঁর সামনে প্রকাশিত হয়ে তাঁর

অনেক অনেক প্রশংসা করলেন এবং খুশি হয়ে তাঁকে আকাশগামিনী বিদ্যা দান করলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, "হে শ্রাবকোত্তম! তোমাকে যে আকাশগামিনী বিদ্যা আজ আমরা প্রদান করলাম, এর সাহায্যে তুমি আকাশে বিচরণ করতে পারবে। শুধু তা'ই নয়, পঞ্চনমস্কার মহামন্ত্রের সাধন বিধির সাথে তুমি যদি এই বিদ্যা কাউকে দান কর, তাহলে সেই ব্যক্তিও এই বিদ্যায় সিদ্ধ হবে"। এই কথা বলে দেবতা দু'জন স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

আকাশগামিনী বিদ্যা লাভ করে জিনদত্ত অত্যন্ত খুশি হলেন। জিনভক্ত জিনদত্তের মনে অকৃত্রিম চৈত্যালয়সমূহ দর্শন করার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু সেই স্থান মানুষের অগম্য হওয়ায় কোনো মানুষের পক্ষে সেগুলির দর্শন অসম্ভব। দেবতারা ছাড়া কেউ সেখানে যেতে পারেন না। কিন্তু এখন আকাশগামিনী বিদ্যা লাভ করায় জিনদত্তের পক্ষে অকৃত্রিম চৈত্যালয়গুলি দর্শন ও পূজনের অভাবিত সুযোগ এসে গেল। অনেক পুণ্যের ফলে জীব দেবগতি লাভ করে যে সুযোগ পায়, মনুষ্যভবেই জিনদত্ত সেই দুর্লভ সুযোগ লাভ করলেন।

আকাশগামিনী বিদ্যা লাভ করা মাত্রই জিনদত্ত তাঁর সেই অসম্ভব স্বপ্ন সাকার করার কথা ভাবলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এই বিদ্যার সাহায্যে অকৃত্রিম চৈত্যালয় দর্শন করার জন্য আকাশপথে গমন করলেন। সেখানে খুব ভক্তিভরে জিন ভগবানের পূজন করলেন। জিন ভগবানের পূজার মাধ্যমেই স্বর্গ ও মোক্ষ সুখ লাভ হয়।

এরপর থেকে জিনদত্ত প্রতিদিন প্রত্যুষে অকৃত্রিম জিনবিম্ব দর্শনে যেতেন। অকৃত্রিম চৈত্যালয় দর্শন ও পূজন করার পরই তাঁর দৈনন্দিন কাজ শুরু হত। তাঁর প্রতিদিন সকালে বেরিয়ে যেতে দেখে তাঁর বাগানের মালীর খুব কৌতূহল হত, শেঠজী প্রতিদিন যান কোথায়! এক দিনের কথা। তিনি যথারীতি সকালে প্রস্তুত হয়ে বেরোতে যাচ্ছেন, এমন সময় কৌতুহল দমন করতে না পেরে মালী সোমদত্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "শেঠজী! আপনি প্রত্যহ সকালেই স্নান করে কোথায় যান"? শ্রাবক মাত্রই সত্যাশ্রয়ী; কাজেই জিনদত্ত তাঁকে মিথ্যা কথা বলতে পারলেন না। তিনি সত্যই বললেন। তিনি বললেন, " দুই দেবতার অনুগ্রহে আমি আকাশগামিনী বিদ্যা লাভ করেছি। সেই বিদ্যার সাহায্যে আমি প্রত্যহ সাধারণ জীবের পক্ষে অগম্য সুবর্ণময় অকৃত্রিম জিনমন্দিরসমূহ দর্শনে যাই। এই দর্শনের ফলে সুখ ও শান্তি লাভ হয়"। একথা শুনে সোমদত্তের খুব লোভ হল। সে জিনদত্তকে মিনতি করতে লাগল, "হে প্রভু! আপনি আমাকেও এই বিদ্যা শিখিয়ে দিন। আমি তাহলে প্রত্যহ বাগানের সুরভিত পুষ্প নিয়ে

ভগবানকে পুজো করতে যেতে পারব। এই ভাবে আমিও শুভ কর্মবন্ধ করতে পারব। আপনি আমার উপর কৃপা করে আমায় পুণ্য অর্জনের সুযোগ দান করুন"।

সোমদত্তের মিনতি শুনে জিনদত্ত বুঝলেন, এই বিদ্যা শেখার আগ্রহের পিছনে সোমদত্তের কোনো পার্থিব বিষয়ের প্রতি লোভ নেই। তাঁর লোভ শুধু পুণ্যার্জনের। তাঁর ভক্তি ও পবিত্রতা উপলব্ধি করে জিনদত্ত তাঁকে এই বিদ্যা সাধনার পদ্ধতি ভালোভাবে শিখিয়ে দিলেন।বড় ভয়ংকর সে পদ্ধতি। কিন্তু পঞ্চ ণমোকার মহামন্ত্রের প্রতি অটল বিশ্বাস থাকলে কোনো ভয়ই আর ভয় নয়। দেবতারা তো বলেই দিয়েছিলেন, পঞ্চণমোকার মহামন্ত্রের সাথে এই বিদ্যা সাধন করতে হয়।

সোমদত্ত মনোযোগ সহকারে পুরো পদ্ধতি বুঝে নিল এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথির ঘন অন্ধকার রাত্রে এই বিদ্যা সাধন করতে শ্মশানে গেল। অমানিশার পূর্বরাত্রি। বড়ই ভয়ানক। আকাশগামিনী বিদ্যা সাধনের নিয়ম অনুসারে সোমদত্ত একটি বট গাছে উঠে সেই গাছের ডালে এক শো আটটি দড়ি বেঁধে একটি শিকে অর্থাৎ ঝোলা তৈরি করল এবং তাঁর ঠিক নীচেই তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্রশস্ত্র উর্ধ্বমুখ করে পুঁতে রাখল। তারপর পুষ্পাদি দিয়ে সেই অস্ত্রগুলির পূজা করে শিকের উপর উঠে পঞ্চণমোকার মন্ত্র জপ করতে লাগল। মন্ত্র জপ করতে করতে শিকের দড়িগুলি কাটতে হবে। কিন্তু দড়ি কাটার সময় যখনই তাঁর দৃষ্টি নীচের দিকে গেল, তখনই সে ভয়ে কেঁপে উঠল। তাঁরই দ্বারা গ্রথিত অস্ত্রশস্ত্রের ধারালো ও তীক্ষ্ণ ফলগুলো যেন তাঁর পতনের অপেক্ষাতেই এক বুক রক্ততৃষ্ণা নিয়ে অপেক্ষা করছে। সে তখন চিন্তা করল, শেঠজী আমাকে মিথ্যা কথা বলেন নি তো! শেঠজী যদি মিথ্যা বলে থাকেন, তাহলে তো শিকে কাটলেই আমার মৃত্যু অবধারিত। আবার পরক্ষণেই সে চিন্তা করল, শেঠজী আমাকে কেন মিথ্যা বলতে যাবেন? আমাকে এভাবে হত্যা করে তাঁরই বা কী লাভ! তাছাড়া তিনি তো জিনধর্মের প্রতি পরম শ্রদ্ধালু; অতএব দয়াবান। তাঁর রোম রোম করুণায় ভরপুর। তাহলে আমার জীবন তিনি কেন নাশ করতে চাইবেন! এটা ভেবে তাঁর মনে একটু ভরসা হল। কিন্তু যেমনই সে আবার নীচের দিকে তাকাল, সেই অস্ত্রগুলো দেখেই ভয়ের চোটে সেই ভরসা কোথায় উবে গেল। এইভাবে সংশয়ের দোলায় দুলতে দুলতে সে শিকের দড়ি কাটার সাহস না পেয়ে গাছ থেকে নীচে নেমে পড়ল। একবার মনে জোর এনে সে গাছে উঠল, আবার ভয় পেয়ে নীচে নেমে এল। এইভাবে সে একবার উঠতে থাকল, আবার নামতে থাকল। আসলে

যার হৃদয়ে জিনবচনের প্রতি অটুট বিশ্বাস নেই, মনে তাঁর উপর দৃঢ় নির্ভরতা নেই, তাঁর পক্ষে ত্রিলোকে কোনো কিছু সাধন করাই অসম্ভব।

এদিকে যখন সোমদত্ত সংশয় ও নিশ্চয়ের দোলায় গাছে ওঠানামা করছে ঠিক সেই সেই সময় অঞ্জন নামে এক চোর তাঁর প্রেমিকা মণিকাঞ্চন নামক সুন্দরী বারবণিতার ঘরে তাঁর সাথে প্রেমালাপ করছে। প্রেমাবিষ্ট অঞ্জনের কাছে মণিকাঞ্চন আবদার করল, "হে প্রাণবল্লভ! আজ আমি মহারাজ প্রজাপালের পাটরানী কনকবতীর গলায় এক অতি সুন্দর রত্নহার দেখলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ হারের তুল্য এত সুন্দর আর মূল্যবান হার পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। ঐ হারটি আমার চাই। অতএব, তুমি আমাকে ঐ হারটি এনে দাও; তবেই তুমি আমার স্বামী হতে পারবে। অন্যথায় তোমার সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে না"। এ'রকম অবাস্তব আবদার শুনে অঞ্জন চোর তো প্রথমে চমকে গেল। অজস্র সশস্ত্র রক্ষী পরিবেষ্টিত রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে স্বয়ং রানীর গলা থেকে হার চুরি করে আনা কীভাবে সম্ভব! কিন্তু মণিকাঞ্চনের সেই এক কথা। ফলে তাঁর প্রতি আসক্তি এমন অসম্ভব কাজেও অঞ্জনকে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করল। সে নিজের প্রাণের পরোয়া না করে চুরি করতে বেরিয়ে পড়ল। যথাসময়ে রাজমহলের কাছে পৌঁছে ঠিক সুযোগমত রক্ষীদের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রাসাদে ঢুকে পড়ল। বেড়ালের মত নিঃশব্দ পদক্ষেপে রানীর শয়নকক্ষে ঢুকে নিপুণ হাতে রানীর গলা থেকে হারটি খুলে নিল। এরপর সে ফিরে চলল। অঞ্জন অত্যন্ত দক্ষ চোর। তাই অন্ধকারের আড়ালে সে পাহারাদারদের দৃষ্টি এড়িয়ে রানীর মহল পর্যন্ত ঢুকে পড়তে পেরেছিল। কিন্তু তাঁর চুরি করা ঐ হারই তাঁর বিপদের কারণ হল। ঐ রত্নহারের দিব্য আলো গাঢ়তম অন্ধকারকেও দূর করতে সক্ষম। ফলে রত্নহারের উজ্জ্বল আলোতেই প্রহরীরা তাঁকে দেখতে পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হইচই শুরু হয়ে গেল। শত শত প্রহরী তাঁকে ধরার জন্য দৌড়াল। অঞ্জনও ভালোই দৌড়ায়, কিন্তু রক্ষীদের সাথে সে আর কতক্ষন পারবে! যখন সে দেখল, সে প্রায় ধরা পড়ে গেছে, তখন সে বুদ্ধি করে হারটা অন্যদিকে জোরে ছুঁড়ে দিল। রক্ষীরা তখন হারটা উদ্ধার করার জন্য দৌড়াল এবং অঞ্জন সেই সুযোগে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দৌড়ে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে রক্ষীরা সেই হার উদ্ধার করে আবার অঞ্জনের পিছু নিয়েছে।

দৌড়তে দৌড়তে অঞ্জন ততক্ষনে সেই শ্মশানে এসে পৌঁছল, যেখানে সোমদত্ত আকাশগামিনী বিদ্যা সিদ্ধ করার জন্য এসেছিল। সোমদত্তের সেই মাটিতে গাঁথা অস্ত্র এবং তাঁর

গাছে ওঠানামা দেখে অঞ্জন বেশ অবাক হয়ে গেল। সে সোমদত্তকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এটা কী করছ? এ'রকম অদ্ভুত আচরণ করছ কেন? এই অস্ত্রশস্ত্রগুলোই বা এভাবে মাটিতে গেঁথে রেখেছ কেন? তুমি কি আত্মহত্যা করতে এসেছ"? অঞ্জনের প্রশ্নের উত্তরে সোমদত্ত সবকিছু তাকে খুলে বলল। সব শুনে অঞ্জন চিন্তা করল, প্রহরীরা যেভাবে আমার পিছু নিয়েছে, তাতে ধরা আমি পড়বই। আর, ধরা পড়লে আমার মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত, কেননা আমি যেটা করেছি, সেটা কোনো ছোটোখাটো অপরাধ নয়। রাজমহলে ঢুকে স্বয়ং পাটরানীর গলা থেকে হার খুলে নেওয়ার দুঃসাহসের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অতএব, মরতে যখন হবেই, তখন ধর্মের আশ্রয় নিয়ে মরাই ভালো। এই রকম চিন্তা করে সে সোমদত্তকে বলল, " আরে, এই সামান্য বিষয়ে তুমি ভয় পাচ্ছ? আচ্ছা, ঠিক আছে; তোমার তলোয়ারটা আমাকে দাও তো। আমিও একবার চেষ্টা করে দেখি"। এই বলে সে সোমদত্তের কাছ থেকে তাঁর তলোয়ারটা নিয়ে ঐ গাছটায় উঠে শিকের মধ্যে বসে পড়ল। এরপর যখন সে শিকে কাটতে গেল, তখন তাঁর খেয়াল হল যে, সোমদত্ত যে মন্ত্রটার কথা বলেছিল, সেই মন্ত্রটাই সে ভুলে গেছে। কিন্তু সেজন্য বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে সে চিন্তা করল, "জিনদত্ত শেঠ পরম জিনভক্ত; অতএব, তাঁর কথাটাই প্রমাণ"। তাই জিনদত্তের কোথায় গভীর বিশ্বাস রেখে মন্ত্রের পরিবর্তে সে মনে মনে বলল, "শেঠজী যা বলেছেন, সেই মন্ত্র আমার মনে নেই কিন্তু সেই মন্ত্র নিশ্চয়ই আমাকে সিদ্ধ করবে"। এই কথা বলতে বলতে সে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কিত হয়ে শিকের সব দড়িগুলি তলোয়ারের এক কোপে কেটে দিল। শিকের দড়িগুলে কেটে যাওয়ায় সে নীচে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে যে মুহূর্তে সে নীচের অস্ত্রগুলোর উপর পড়বে, ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশগামিনী বিদ্যা তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলল, " হে প্রভু! আমি আপনার আজ্ঞাবহ। তাই আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছি। বলুন, কোথায় যেতে চান এখন"। বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করে অঞ্জন চোর তো মহা আনন্দিত। সে বিদ্যাকে বলল, "মেরু পর্বতে যেখানে জিনদত্ত শেঠ ভগবানের পুজো করছেন, সেখানে আমাকে পৌঁছে দাও"। বলা মাত্রই আকাশগামিনী বিদ্যা তাঁকে জিনদত্তের কাছে নিয়ে গেল। ধর্মের কী অপূর্ব মহিমা! ধর্মে অটুট বিশ্বাসের কারণে অঞ্জন চোরের মত নীচ অপরাধীও আকাশগামিনী বিদ্যার মত দুর্লভ সিদ্ধি লাভ করতে পারে।

শেঠ জিনদত্তের কাছে গিয়ে অঞ্জন ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করল। তারপর বলল, "হে করুণাসাগর! আমি আপনার কৃপায় আকাশগামিনী বিদ্যা তো লাভ করেছি, কিন্তু এবার আমাকে

এমন মন্ত্র দান করুন, যার সাহায্যে আমি সংসার সাগর পার হয়ে মোক্ষ লাভ করতে পারি"।

চোর হিসেবে অঞ্জন চোর কুখ্যাত ছিল। শেঠ জিনদত্তও তাঁকে জানতেন। অঞ্জন চোর ইচ্ছা করলে আকাশগামিনী বিদ্যার সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চুরি করে বেড়াতে পারত। কিন্তু তা না করে সে যে মোক্ষপথের পথিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করল, সেটা দেখে জিনদত্ত বুঝতে পারলেন, সত্যিই অঞ্জনের মনে বৈরাগ্য জন্ম নিয়েছে। তাই, তাঁর এই বৈরাগ্যপূর্ণ কথা শুনে শেঠ জিনদত্ত তাঁকে এক চারণঋদ্ধিধারী মুনির কাছে তাঁকে নিয়ে গেলেন। যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে মুনি তাঁকে জিনদীক্ষায় দীক্ষিত করলেন। তারপর অঞ্জন চোর অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে সাধু হয়ে তপস্যার জন্য কৈলাসে চলে গেল। সেখানে কঠোর তপস্যা করে ধ্যানের প্রভাবে সে চার ঘাতী কর্ম নাশ করে কেবলজ্ঞান অর্জন করল এবং ত্রিলোকপূজ্য হয়ে উঠল। যখন তাঁর আয়ুকর্মপূর্ণ হল, তখন মুনিরাজ অঞ্জন শেষ চার অঘাতী কর্মকেও নাশ করে সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হয়ে অনন্ত অবিনশ্বর মোক্ষপদ প্রাপ্ত হল।

প্রাচীন থেকে অর্বাচীন – সমস্ত জৈনাচার্যগণ জৈনধর্মকে মোক্ষমার্গ বলে অভিহিত করেছেন। এই ধর্মের মূল লক্ষ্য হল ভব্য জীবকে এই জন্মজরামরণসঙ্কুল সংসারসাগর থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে তাঁকে অনন্ত বীর্য, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত শক্তি ও অব্যবাধ সুখ সম্পন্ন মোক্ষপদ লাভে প্রেরিত করা। এই মোক্ষমার্গের প্রথম ধাপ হল সম্যগদর্শন। তত্ত্বার্থসূত্রকার তাঁর শাস্ত্রের প্রথমেই বলেছেন, "সম্যগদর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ"। সম্যগদর্শন ব্যতীত জৈন হওয়া যায় না। শুধু জৈন কেন, সম্যগদর্শন ছাড়া কোনো ব্যক্তি ধার্মিকই হতে পারে না। 'মুলাচার' আদি জৈন শাস্ত্রে সম্যকদর্শনের আট অঙ্গের কথা বলা হয়েছে –

ণিস্সংকিদ নিক্কংখিদ ণিব্বিদগিচ্ছা অমূঢদিট্ঠি য।
উবগূহণ ঠিদিকরণং বচ্ছল্লং পহাবনা যতে অট্ঠ।।

অর্থাৎ সম্যকদর্শনের আট অঙ্গ হল নিঃশঙ্কিত, নিষ্কাঙ্ক্ষিত, নির্বিচিকিৎসা, অমূঢ়দৃষ্টি, উপগূহন, স্থিতিকরণ বাৎসল্য এবং প্রভাবনা।

এঁদের মধ্যে প্রথম অঙ্গ নিঃশঙ্কিত অঙ্গের উদাহরণ হিসেবে অঞ্জন চোরের কাহিনী এক অনবদ্য উদাহরণ হয়ে আছে। সারাজীবন চুরির মত জঘন্য কাজ করেও শুধুমাত্র নিঃশঙ্কিত হওয়ার কারণে সে দেবদুর্লভ মোক্ষপদ লাভ করেছিল। 'আরাধনা কথা কোষে' তাঁর এই

কাহিনী উল্লিখিত আছে। এই কাহিনী আমাদের সকলকে এই বার্তা দেয়, "হে ভব্য জীব! তোমরা মোক্ষপদের অভিলাষী হলে তোমাদের অবশ্যই সর্বাগ্রে নিঃশঙ্কিত হতে হবে। নিঃশঙ্কিতাদি অষ্ট অঙ্গ সমন্বিত সম্যগদর্শনের মাধ্যমেই তোমাদের মোক্ষমার্গে যাত্রার শুভ সূচনা হোক"।

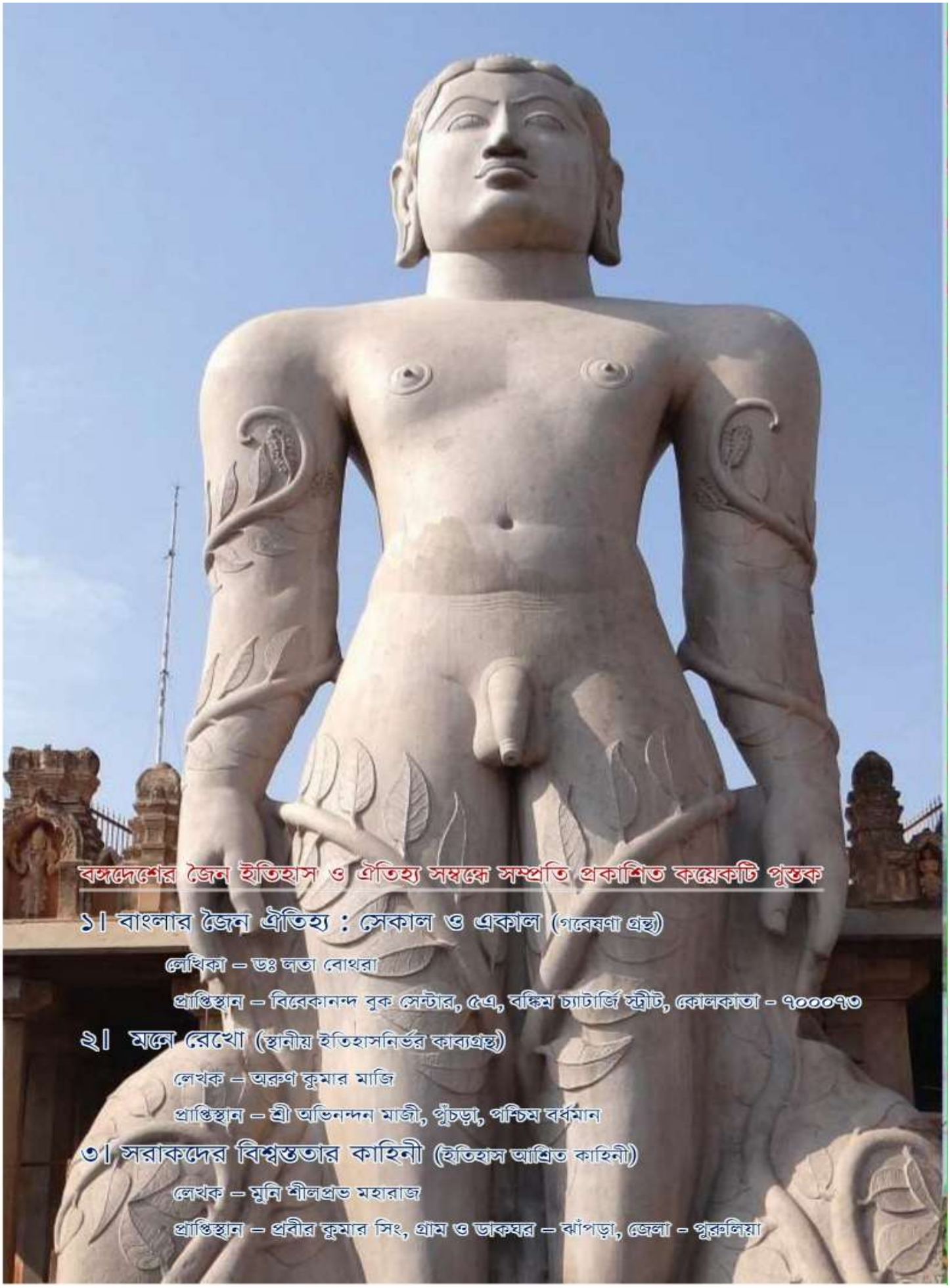

বঙ্গদেশের জৈন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তক

১। বাংলার জৈন ঐতিহ্য : সেকাল ও একাল (গবেষণা গ্রন্থ)

লেখিকা – ডঃ লতা বোথরা

প্রাপ্তিস্থান – বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ৫এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭০০০৭৩

২। মনে রেখো (স্থানীয় ইতিহাসনির্ভর কাব্যগ্রন্থ)

লেখক – অরুণ কুমার মাজি

প্রাপ্তিস্থান – শ্রী অভিনন্দন মাজী, পুঁচড়া, পশ্চিম বর্ধমান

৩। সরাকদের বিশ্বস্ততার কাহিনী (ইতিহাস আশ্রিত কাহিনী)

লেখক – মুনি শীলপ্রভ মহারাজ

প্রাপ্তিস্থান – প্রবীর কুমার সিং, গ্রাম ও ডাকঘর – ঝাঁপড়া, জেলা - পুরুলিয়া